বাউয়িন

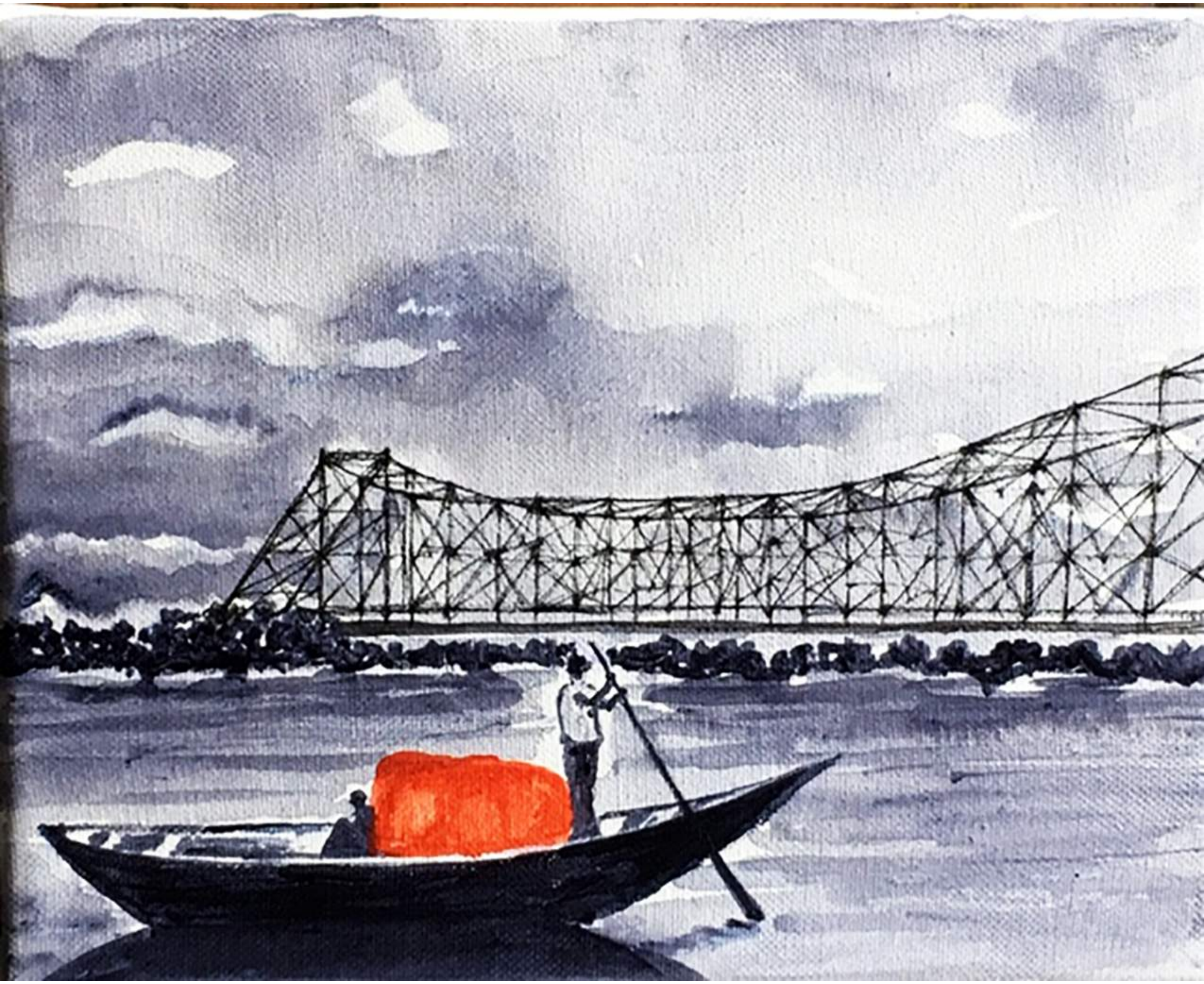

কাগজের নৌকা

কাগজের নৌকা

পঞ্চদশ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০২১

সম্পাদনা

অনুশ্রী ব্যানার্জী
সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 15 : January 2021

Editors
Anusri Banerjee
Sanjoy Chakraborty

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay

Sub Editors (Volunteer)
Sugandha Pramanik, Melbourne, Australia

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh — **Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Ranjita Chattopadhyay — **Photo : Inside Front Cover**

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা । পেশায় শিক্ষিকা । আর নেশায় পড়ুয়া । বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত । রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি । রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা । গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে । শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত । সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys'' । সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার ।

Mousumi Roy — **বেনারসে গঙ্গার ঘাট : Title Page**

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ । যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে । পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা । উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি ।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

বিদেশে বসে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মধ্যে যে দূরূহ প্রচেষ্টা থাকে তা বোধকরি অনেকেরই অজানা। জন্মভূমিকে কর্মসূত্রে ছেড়ে আসার ফলস্বরূপ হয়ে রয়ে থাকে একটুকরো সোনালী স্মৃতি। সেই স্মৃতি গাঙচিলের মতো পাখা মেলে ওড়ে ধানসিঁড়ি নদীর তিরতিরে বয়ে যাওয়া জলের ওপর। আর আমরাও চেয়ে থাকি সেই জীবন নদীর ধারার দিকে।

কিন্তু সে'তো সতত বহমান। প্রতিদিনের জমে ওঠা কতো ছোট্ট ছোট্ট কথাকে তার পাড়ে রেখে সে এগিয়ে চলে। তাই প্রতি নিয়ত চলে সেই জীবনের গল্পকে খুঁড়ে খুঁড়ে খোঁজা, ফিরে ফিরে দেখা।

কবি পাবলো নেরুদা লিখেছেন;

You are the daughter of the sea, oregano's first cousin.
Swimmer, your body is pure work,
cook, your blood is quick as soil.
Everything you do is full of flowers, rich with the Earth.

তাই পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তে থাকা একগুচ্ছ সাহিত্যপ্রেমীর লেখনী নিয়ে বরাবরের মতো "কাগজের নৌকা" আপনাদের সামনে এসেছে পাঠকের ভালোবাসা নিয়ে।

জীবনানন্দ বলেছিলেন

"... সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে ..."

আমরাও কি আমাদের জন্মভিটার চির প্রশয় খুঁজে পেয়েছি ? হয়তো না আজও, তাই বর্ষার জলে ছোট্ট বেলার কাগজ ভাঁজ করে বানানো নৌকো তে চড়ে একবার ছুঁয়ে আসাই যায় সতত বহমান স্মৃতি, বরাবরের মতো, এবারের "কাগজের নৌকা"য় ?

"... ফিরতি হাওয়া'রা জানে কথা ছিলো কতো,
ফের যদি ছোঁয়া যেতো তাকে অন্তত ?"

২০২১ সাল নিয়ে আসুক বসন্তের বাতাস, আনন্দ আর সুস্বাস্থ্য। সকলকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শুভ কামনা।

অনুশ্রী ব্যানার্জী
সঞ্জয় চক্রবর্তী

একুশে ফেব্রুয়ারী

"একটুখানি আগুন লেখো / একটুখানি ঝড়
একটুখানি তর্জনী, আর / একটু পরস্পর - - -
কঠিন এবং তরল লেখো / পাথর এবং জল
ঋতুর পাশে এই বসতি / এখানে জঙ্গল - - -
বুকের নিচে মেঘের কোলাহল - - -"

– রণদেব দাশগুপ্ত

যে ভাষায় ঝড় লিখি আর আগুন লিখি সেই ভাষাটিকে আঁকড়ে পথ চলা আমাদের। সে ভাষার বিপন্নতায় বুকে তোলপাড়। শোণিতে বিপ্লবের আগুনের স্রোত। মাতৃভাষাকে ঘিরে কেন এ তীব্র আবেগ ? আসলে ভাষাহীনতা অস্তিত্বহীনতার নামান্তর। ভাষা তো শুধু কথা বলা বা লেখার জন্য নয় ! ভাষা ধরে রাখে বহু এক জনগোষ্ঠীর বহু প্রজন্ম ধরে লালিত ও অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার। তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও মনন।

ভাষার বিপন্নতা তাই উদ্বেগজনক। কোন মানুষের জাতিগত ও সমাজগত পরিচয় প্রতিফলিত হয় তার ভাষায়। কোন একটা ভাষার মৃত্যু হলে সেই ভাষায় কথা বলা মানুষের হাজার হাজার বছরের চিন্তাভাবনার ঐতিহ্য চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় তার রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্কের ধারা, শিক্ষা ও দর্শন। এককথায় ভাষার মৃত্যুতে অনিবার্যভাবে হারিয়ে যায় গোষ্ঠীবিশেষের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সে ভাষায় গান বাঁধা হয় না আর। লেখা হয় না কবিতা। বংশ পরম্পরায় বয়ে চলা গল্পের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

গত একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিনটির ইতিহাস বাঙালীমাত্রেরই জানা।

"ভাষার জন্য যুদ্ধ যে এই, বিশ্বে নেই কো তার তুলনা
আমার ভাষা বয় শোণিতে, সেই কথাটি – না, ভুলো না
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
ও একুশে ফেব্রুয়ারি, আজ শুধু নয়, আজীবনেও
বাসব ভালো আমার ভাষা, অপরাজিতা, অপরাজেয়!"

– মাতৃভাষার জন্য / মন্দাক্রান্তা সেন

বাংলা ভাষাকে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না। এই আমাদের একুশের শহীদদের প্রতি অঙ্গীকার। বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় মগ্ন মানুষদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

"কাগজের নৌকো'র ২০২১ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। ধারাবাহিক রচনার আকর্ষণীয় সম্ভারে সাজান কাগজের নৌকো।" ভারহীন গতিতে তরতর করে এগিয়ে চলুক এই নৌকোখানি। পালে যেন আপনাদের ভালবাসার বাতাসটুকু লাগে এই আমাদের চাওয়া।

ধন্যবাদান্তে,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
২২ শে ফেব্রুয়ারী
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

সুখপাখি	শ্যামলী আচার্য	৬
চা-ঘর	রমা জোয়ারদার	১৪
সময়	সৌমিত্র চক্রবর্তী	১৯
পরবাসী	শকুন্তলা চৌধুরী	২৬
সনেটগুচ্ছ	পল্লববরন পাল	৩৯
আব্দুল চাচার লড়াই	মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	৬০
অতলান্ত কথা	সুব্রত ঘোষ	৬৬

গল্প ও অন্যান্য

পুরোনো দিনের কথা	প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	৩৩
লিমেরিক	তন্ময় চক্রবর্তী	৩৬
আসুন, গল্পটা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি	বিশ্বদীপ চক্রবর্তী	৪০
সমরেশ বসুর দুনিয়া	অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	৫৪
পাঠ প্রতিক্রিয়া	পারিজাত ব্যানার্জী	৭৩
পাঠান্ত ভাবনা	শাশ্বতী বসু	৭৫

শ্যামলী আচার্য

সুখপাখি

(১)

রোদ্দুর শব্দটা যে কোনও দুষ্টু ছেলেকে মানায়। তার সবসময় চোখমুখ কুঁচকোনো। মনে মনে ভেঁজে চলেছে জ্বালাতন করার প্ল্যান। কখনও বেপরোয়া। চারপাশ ঝলসে দেবে। নির্দয়। কখনও মিষ্টি। কমলালেবুর খোসা চিপে তখন রস ছিটিয়ে দেয় চোখের মধ্যে। সকালের রোদ আর বিকেলের রোদ – উচ্চারণেই কত তফাৎ। অনুভূতির মধ্যেও। একটা রিনরিনে শব্দ। একটা টুং টাং। দুপুররোদে স্টিমারে পদ্মানদী পেরোনোর সময় আশ্চর্য এক রোদ্দুর ঝলমল করছিল নদীর জলে। ওই রোদ্দুরে ঝাঁপ দেওয়া যায়।

ইমন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল নদীর দিকে। স্টিমার জল কেটে এগোয়। ইঞ্জিনের ভুটভুট শব্দ। ইলিশমাছ ভাজা আর ভাত খাওয়ার ভিড় দোতলায় ওপরের খোলা জায়গায়। খাবার জায়গা। কাঠের বেঞ্চি। গাঢ় সবুজ রঙ এখন ফ্যাকাশে কোথাও কোথাও। বেঞ্চিতে একটা ছোট্ট পেরেক বাঁচিয়ে বসল দুজনে। একটু আগেই ইমন আর দিলীপ ওখানে বসে পরিতৃপ্তি করে খেয়েছে। ওরা যতটা ভাত দিয়েছিল, ততটা ইমন দু'বেলা বসে খেলেও শেষ হবে না। ভাত ফেলতে বড় মায়া লাগছিল। দিলীপ নিরাসক্তভাবে থালায় খানিকটা ভাত ফেলে উঠে গেল। ইমন যতটা পারে, মাছভাজার তেল আর শুকনো মরিচ পোড়া দিয়েই খেয়ে নিল। পাগল-করা গন্ধ। ওর কেমন মনে হচ্ছিল, যতটা পাওয়া যায়। যতটা নেওয়া যায় কুড়িয়ে-কাছিয়ে।

"এই চাউলের ভাত মুখে রুচল আপনের ?"

দিলীপদা'র প্রশ্নে স্মিত হাসি ফেরত দেয় ইমন। ওটুকুই উত্তর। বাকিটা রয়েছে চেটেপুটে খাওয়া থালার মধ্যে।

"অ দিলীপদা, পৌঁছাইতে আর কতক্ষণ সময় লাগব কইতে পারেন ?"

ইমনের কথার বাঙালভাষার টান শুনে দিলীপ মনে মনে হাসে।

কলকাতার লোকেদের এই এক বদভ্যেস। যা পারে না, তা'ও জোর করে জাহির করতে চায়। ক্যালকাটার বাংলা কি তারা বোঝে না ?

দিলীপ মুখে বলে, "আর বেশি না। আয়্যাই পড়সি। এই ধরেন আধা ঘন্টা"।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগেই বলেছেন ঢাকা থেকে বরিশাল রুটে এবার রেল যোগাযোগ তৈরি হবে। ঢাকায় মনুকাকার বাসায় গতকাল রাতে সেই কথাই হচ্ছিল। অনেক ভোরে উঠে বাস ধরতে হবে। তাই আর গভীর রাত অবধি আড্ডা জমেনি গতকাল। কিন্তু ঢাকা থেকে এখনও বরিশাল যাওয়ার বন্দোবস্তে বেশ জটিলতা। সেইসব নিয়ে কথা হল অনেকক্ষণ।

কাকা বলছিলেন ছেলেবেলায় ভূগোল বইতে নাকি প্রশ্ন থাকত, কোন জেলায় ট্রেন নেই ? উত্তর ছিল, বরিশাল। তখনও টাঙ্গাইল বা পটুয়াখালি আলাদা জেলা হয়নি। আর পাহাড়ি চট্টগ্রামের তিন জেলাকে পাকিস্তানি শাসকেরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।

ধান, নদী, খাল ... এই তিন নিয়ে বরিশাল। আইতে শাল, যাইতে শাল। জলপথে নৌকো বা শালতি ছাড়া গতি নেই। সেখান থেকেই 'শাল'। সেখানকার খ্যাতির চেয়ে অখ্যাতির পাল্লা ভারি বরাবর। যদিও ইমনের জন্ম খাস দক্ষিণ কলকাতায়, তবুও শিকড়ের খোঁজ নিলে 'বরিশাল' শব্দটিতে এখনও স্পষ্ট অবজ্ঞা, উপহাস আর কিছু কাদার ছিটে। নয়ের দশকে কলেজজীবন কাটালেও বরিশাল শব্দের ছায়া ক্যান্টিনের আড্ডার মধ্যেও ঢুকে পড়ত।

"তুমি সকালে গাবতলী বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাস ধরবে। আমাদের এই বাসার কাছেই। সকালে পৌঁছে দিব তোমায়। ওখানে আমার পরিচিত লোক থাকবে। দিলীপ। হিন্দু। দিলীপ তোমার সঙ্গে বরিশাল পর্যন্ত যাবে। মনে রেখো, সাকুরা কোম্পানির বাস। এসি বাস। কোনও অসুবিধা হবে না। যাওয়া-আসার টিকিট কাটাই আছে। খুব বেশি হলে ছ'সাত ঘন্টা লাগার কথা। মাঝে পদ্মানদী পেরোবে। বার্জ পেরোনোর সময় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ওই সময়ই যা দেরি হয়। তারপর পদ্মা পেরিয়ে খানিক গেলেই বরিশালের নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যাণ্ড। ওখানে দিলীপ পৌঁছে দিবে তোমায়। ও তারপর চলে আসবে"।

মনুকাকার সাধু-চলিত-বাঙাল মেশানো কথার মধ্যে আলাদা করে 'হিন্দু' শব্দটা কানে খট করে লাগল ইমনের। কিছু করার নেই বোধহয়। এখানে তুমি সংখ্যালঘু। নিঃসহায়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমনটাই তো হবার ছিল। অন্তত রাষ্ট্রনায়কেরা তো তাই চেয়েছিলেন। কাজেই তাদের ঠাণ্ডাঘরের নিখুঁত পরিকল্পনার বলি সাধারণ মানুষ। তাদের ভোট দেবার অধিকার আছে, মত প্রয়োগের অধিকার নেই। শুনবে কে?

বাংলাদেশে নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে আসবে শুনে ইমনকেই বা কে ছেড়ে কথা বলেছিল?

"আমার কিন্তু বরিশালে দিন সাতেক থাকতে হবে কাকা। তার বেশিও লাগতে পারে। আগে পৌঁছই, তারপর বুঝতে পারব। আপনি ফেরার টিকিট কেটে ফেলেছেন?"

"তুমি তোমার কাম সারো আগে। টিকিট কাটা কোনও ব্যাপারই না। ওই তো সাতশো টাকা ভাড়া। এত ভাইব্যো না। সাবধানে যাও। বরিশাল শহরে কাম শ্যাষ হইলে বাটাজোড়ে যাইয়ো একবার।"

"যাব কাকা। চিন্তা করবেন না। সবাইকে ফোন করে নিয়েছি।"

মনুকাকা ইমনের নিজের কাকা নন। মনুকাকা সম্পর্কে ইমনের খুড়শ্বশুর। ভালো নাম সদানন্দ ভট্টাচার্য। আক্ষরিক অর্থেই সদানন্দ। ফূর্তিবাজ। সার্থকনামা মানুষ। ডাকনাম মনু। এ'ও বরিশালের নিজস্বতা। বাড়ির ছোট ছেলে বা ছোট মেয়ে মানেই সে মনু। 'অ মনু' বরিশাল জেলার বড় আদরের সম্বোধন। এই কাকা বাড়ির বারোজন ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। অতএব সকলের 'মনু'। ইমন ঢাকায় এই বাড়িতে এসে অবধি স্মার্ট ইয়ং জেন্টলম্যানটিকে শ্বশুরস্থানীয় ভাবতেই পারেনি। বরং ভীষণ মাই ডিয়ার এই ভদ্রলোককে স্বচ্ছন্দে 'মনুদা' বলেই ডাকা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা আনকনস্টিটিউশনাল হয়ে যাবে। শত হলেও শ্বশুরবাড়ি। এতটা প্রগলভ না হওয়াই ভালো। মনে মনে অত্যন্ত ফিচকেমি গোপন করে রীতিমত সম্ভ্রম দেখিয়ে চলছে সে। আসলে শুধু খুড়শ্বশুরকে দাদাস্থানীয় নয়, খুড়শাশুড়িকেও স্বচ্ছন্দে বউদি ভাবতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। শান্তাকাকিমা তাঁর নামের ঠিক বিপরীত মেরুতে থাকেন সর্বক্ষণ। এই ছুটে পুলিপিঠে বানিয়ে ফেললেন, রসবড়া নিয়ে এলেন একগাদা, প্রচুর মালপোয়া সাজিয়ে দিলেন প্লেটে... "ও কাকিমা, করেন কি! আমি কী রাক্ষস?"

"আরে খাইয়্যা লও। কলকাতায় কে এইসব বানাইয়্যা দিব শুনি?"

তা ঠিক। নাগরিক ব্যস্ততায় কত কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। মা চলে যাবার পর তো পিঠে-পুলির পাট উঠেই গেল।

সকালে মার্কেটে গিয়ে দুম করে তিনখানা ঢাকাই শাড়ী নিয়ে এসে হাজির কাকিমা।

“যেইখান পছন্দ হইব, সেইখান রাখো। তিনখান মনে ধরলে, তিনটাই। কাকায় দিছে। লজ্জা কইরো না”।

লজ্জা করবে কি, ইমন তো অপ্রস্তুতের একশেষ। একসঙ্গে তিনটে ঢাকাই ! কোনও মানে হয় ? ইমন তো শাড়িই পরে না। বাঙালিনিদের মতো তার শাড়ির বিলাস নেই একেবারেই। ঢাকায় এসে ঢাকাই জামদানি দেখেও তার বিন্দুমাত্র হেলদোল হয় না। আলমারিতে পড়েই থাকবে। হঠাৎ অনেকদিন পরে খুলে দেখা যাবে ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে শাড়িটা। তখন ভারি কষ্ট হয়। কতগুলো টাকা নষ্ট। অহেতুক অপচয়। ওই টাকাটা দিয়ে অন্য কত কিছু করা যেত। অবশ্য অন্য কিছু মানেই বই কেনা। ইমনের হাতে টাকা এল মানেই জলস্রোতের মতো খরচ হয়ে গেল বইয়ের পিছনে। এই নিয়ে কম অশান্তি হয় বাড়িতে!

ঢাকায় এসে ইস্তক বই কেনার জন্য ছোঁক ছোঁক করছে ইমন। বিশাল এক লিস্ট ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস নয়। এই দেশের গল্প। এই দেশ ভাঙার গল্প, গড়ে ওঠার কাহিনি। নাঃ, এখন নয়। মনকে সংযত করে ইমন। ফেরার সময় বইপত্র কিনে নিয়ে একবারে ফ্লাইটে উঠবে।

কিন্তু তার আগে বরিশাল। দ্যাশের বাড়ি। মাটির টান।

(২)

“অ ফুলু, গেলি কই ?”

হাঁক পাড়েন বিনোদিনী। সকাল থেকে এই ছেলেটাকে নিয়ে অতিষ্ঠ। ছাওয়ালডার দামালপনার শেষ নেই। উঁচু পাঁচিল বেয়ে আমগাছের কোন মগডালে গিয়ে উঠেছে। এবার ঝাঁপ দেবে বাড়ির পিছনের পুকুরে। গত দুদিন ধরে এই নতুন দৌরাত্মি চলছে। আর পারা যায় না। বংশের প্রথম সন্তান বলে কথা। তার অনেক দস্যিপনা হাসিমুখে সইতে হয়। কামলা এসে নালিশ করে, “অ সোনামা, ফুলুর উদ্দণ্ডপনাডা অ্যাকবার দ্যাখেন ...”

আর কত দেখবেন বিনোদিনী।

লাল কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল তুলে দেন মাথায়। সকালের এই সময়টা নিঃশ্বাস ফেলার জো নেই। একা সবদিক দেখতে হয়। মাছের হেঁশেলে একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে। কোটা বাছা ধোওয়া হলে তবে তো রান্না চড়বে। উনুনে আগুন গনগনে হয়ে ওঠেনি এখনও। জলখাবারের আয়োজন এখন। সেগুলো সেরে দিদিশাশুড়ির একাদশীর জোগাড়। সাবু ভিজিয়ে রাখা আছে। নারকেলগুলো কুরিয়ে নিতে হবে চটপট। কলার কাঁদিটার দিকে নজর করেন একবার। বাগানের পুরুষ্টু কাঁদি থেকে বেছে নিতে হবে ডজনখানেক। ভাঁড়ারের অন্ধকার কোনায় রয়েছে ডাঁই করা নারকেল। বাড়ির পিছনের পুকুরপাড়ের সার দেওয়া আশিটা নারকেল গাছের মধ্যে তিরিশটা গাছ থেকে সারা বছর যেক'টা পাওয়া যায়, তাতেই কাজ চলে। সব রান্নাতেই একমুঠো নারকেল কোরা না দিলে নাকি সোয়াদ বাড়ে না।

দিনকতক হল বাড়িতে নতুন একটা জোগাড়ে জুটেছে। নাম হরিদাস। সেটা একেবারেই পোলাপান। একটা কথা বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। বুঝতে সময় নেয়। তার আগেই অবিশ্যি হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দেয় শান্তি। বিনোদিনীর বিশ্বস্ত সহায়িকা। সে পোড়ারমুখী একটা গোটা রুইয়ের আঁশ ছাড়াতে বেলা গড়িয়ে দিল যে। তাকে হাঁকডাক করে তাড়া দেন বিনোদিনী। কর্তা যে কোনও সময়ে বেরুবেন। তাঁর হাতের নাগালে সব গুছিয়ে দিতে হবে। পান সেজে ভেজা ন্যাকড়ায় মুড়ে পিতলের বাক্সে ভরে সাজিয়ে দিতে হবে। জলখাবারের থালার দিকে তাকাতে হবে এবার। নতুন

ধানের চিঁড়ে কুটে এসেছে ভাঁড়ারে। চিঁড়ে, নারকেল, নতুন গুড়। এই সময়ে কর্তার প্রিয় খাবার। এই সব হাজার কাজের মধ্যে ছেলেটার এই দুরন্তপনা। এই লাফ দিয়ে কার ঘাড়ে পড়ল, কখন গোয়ালের বকনা বাছুরটা খোঁটা খুলে দিয়ে চলে এল। গরুর জাবনা-মাখা হাঁড়ির ভেতর সেদিন এক নাগরী খেজুর গুড় কোন ফাঁকে ঢেলে দিয়ে এসেছে। সম্বচ্ছরের গুড় তোলা থাকে। ঘাটের নৌকায় ছইয়ের তলায় সারা দুপুর কাটিয়ে দিল। তাকে খুঁজে খুঁজে সকলে দিশেহারা। কখন কোথায় যে কী করে বেড়ায় ... । রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে। তবেই তো বাড়ি মাথায় উঠবে।

বিনোদিনী এই গাঙ্গুলীবাড়ির ভাগ্যিমানী বউ। এই বাড়ির কর্তা একবাক্যে তাই মানেন। বিনোদিনীর আগে তাঁর আরেকপক্ষ স্ত্রী রয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণ ডাক্তার বনমালী গাঙ্গুলীর প্রথম পক্ষ। সুনয়নী। তাঁর একমাত্র ছেলেটি বছর দশেকের। বংশের প্রথম সন্তান। তায় ব্যাটাছেলে। আদরই আলাদা। সেই অজুহাতেই সে সারাদিন চতুর্দিকে ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়ায় যেন।

ছেলে হবার পর থেকেই সুতিকায় আক্রান্ত সুনয়নী। শয্যাশায়ী। একে একে শরীরে অনেক অসুখ বাসা বেঁধেছে। অথচ কীই বা বয়স। নিজেরই বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই। ছেলে সামলানোর সাধ্যি কী ?

বনমালীর আবার বিয়ের চিন্তাই ছিল না। স্ত্রী অসুস্থ তো কী হয়েছে ? তার চিকিৎসা হবে। যদিও তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার মতে সুনয়নী স্নায়ুর গভীর পীড়ায় আক্রান্ত। এই অসুখ বাড়বে বই কমবে না। নিজের মনে ভুল বকবে, অলীক স্বপ্ন রচনা করবে, ভয় পাবে, কাঁদবে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। মাইনসে কইবে পাগল। কিন্তু ডাক্তারি ভাষায় নিজের স্ত্রীকে পাগল বলে দাগিয়ে দিতে পারেন না বনমালী। মায়া হয়।

"কয় কী! বিয়াডা করবে না ক্যান ?"

"আরে বয়সটাই বা কী? হেয়া ছাড়া পোলাডা দ্যাহননেরো অ্যাট্টা মানুষও চাই ..."

বরিশালে প্রতিবেশি মাতব্বর আর ঘরের স্বজন কুটুমদের জ্বালায় জেরবার। ফরিদপুরে বনমালীর নিজেদের আদি ঘর-বসত। ঢাকা শহর থেকে ডাক্তারি পাশ করে আর নিজের গ্রামে থাকেননি বনমালী। হতদরিদ্র পরিবারের উজ্জ্বল রত্নটি বুঝেছিলেন, তাঁকে শহরে পৌঁছে কাজ করতে হবে। অনেক কাজ তার। দেশ ভাঙছে। ইংরেজ বানিয়ার দল এবার শাসন করবে অশিক্ষিত ভারতবাসীকে। সিপাইরা বেপরোয়া হয়ে প্রভুর দিকে বন্দুক তাক করেছে। এর শোধ ওই বানিয়ার জাত নেবেই। শুধু ব্যবসা করতে তারা সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে এই দেশে আসেনি। তাদের মতলব ব্যাবাক ভালো ঠ্যাকে না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানির ভার পেয়েছে ঠিক একশো বছর আগে। ১৭৬৫ সালে। এই একশো বছর ধরে তারা শুধু নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। উইন্টেল সাহেব যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন, তখন জেলার সদর-অফিস বাখরগঞ্জ থেকে চলে গেল কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম পারে। বরিশাল জেলায়। কেন কে জানে, ছেলেবেলা থেকেই এই বরিশাল মহকুমার দিকে অদম্য টান বনমালীর। তাঁর প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, এই শহরেই তাঁর পসার হবে, নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তির চেয়েও বেশি চেয়েছেন গরিব মানুষের পাশে থাকতে। অর্থের অভাবে শহরে এসে দুঃস্থ পরিবারের মেধাবী ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় না। তাদের জন্য মনের কোনায় একটুকরো পরিকল্পনা পুষে রাখেন বনমালী। যে কষ্ট তিনি পেয়েছেন, সেই কষ্টে যেন আর কোনও ছাত্র ... ।

খানিকটা দায়ে পড়েই কুলীন ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু আর পাঁচজন ব্রাহ্মণের থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা আলাদা পথে চলে। প্রথম পক্ষ বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাপের ঘরে রেখে আসার তিনি তীব্র বিরোধী। অতএব

গৈলা গ্রামের চাটুজ্যে বাড়ির মেয়ে বিনোদিনীকে তিনি নিয়ে আসেন বরিশাল শহরে। তাঁর নিজের সংসারে। বিনোদিনী এই সংসারের অলিখিত কর্ত্রী। কর্তা রোজ বলেন, স্ত্রীয়ের পয়ে তাঁর পসার বেড়েছে বহুগুণ।

খড়মের আওয়াজ শুনেই সচকিত হন বিনোদিনী। কর্তার পায়ের আওয়াজ। অন্দরমহলের দিকে আসছেন মানেই এবার তড়িঘড়ি প্রস্তুত করতে হবে তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কাঁঠালকাঠের পিঁড়ির সামনে বড় ফুলকাটা কাঁসার গেলাসের জলে কর্পূরের মিষ্টি সুবাস। থালায় চিঁড়ে কলা নারকেল গুড়। সামান্য ভোজ্যতেই পরিতৃপ্ত তিনি। শুধু স্বাস্থ্যকর খাদ্য আর দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধিতে সতর্ক নজর তাঁর। এতটুকু ফাঁক পড়ার জো নেই।

খেতে বসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেন চারপাশ।

"পিছার খালের থিকা জল আনলে ফুটায়া নিবা। ওই জল খাবা না। জল ফুটানোর হাঁড়িপাতিলগুলি আবার না মাজিয়া ফ্যালাইয়া রাইখ্যো না"।

বিনোদিনী চুপচাপ শোনেন। ডাক্তার বনমালী গাঙ্গুলীর কথা বরিশালে শোনে না, এমন কেউ আছে নাকি?

"তোমার হাতখান এমন ফ্যাকাশে দেহি ক্যান নয়াবউ?"

ডাক্তার স্বামীর দৃষ্টির সামনে থেকে তাঁর থালায় খাবার বেড়ে দেওয়া হাতদুটি কোথায় সরাবেন বুঝতে পারেন না বিনোদিনী। এই সংসারে এখনও যাঁর পরিচয় 'নয়াবউ' বা নতুন বউ।

উত্তর করেন না কোনও।

"পাওখান দ্যাহাও দেখি"।

এ কী সর্বনেশে কথা! স্বামী হলেন গুরুজন। দেবতুল্য। তাঁকে কাপড় তুলে পায়ের পাতা দেখাতে হবে, এ কেমন অসৈরণ আবদার! ঘোমটা টেনে বিনোদিনী দ্রুত সরে যান সামনে থেকে। বলা তো যায় না, চারদিকে পুষিপোনা ছাওয়াল কামিলা লশকর মাহিন্দরের আওন-যাওন। তার মধ্যেই ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীয়ের অসুস্থতা খুঁজতে না বসে যান। মাইনসে কইবে কি? এখান থেকে আপাতত সরে যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখ এড়ায় না। বিনোদিনীর শরীরে গর্ভলক্ষণ ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে। তৃপ্ত হন বনমালী। প্রথম সন্তানটি পুত্র। বংশে এবার কন্যা আসুক। কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপা। লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীয়ের গর্ভে আসন্ন সন্তানের মঙ্গলকামনায় মনে মনে প্রার্থনা করেন বনমালী। কুলদেবতাকে প্রণাম করেন।

"জহর, নৌকা আইল?"

"হ, কর্তা"।

দামাল ছেলেটাকে এবার ইস্কুলে না পাঠালেই নয়। শহরে গ্যারেট সাহেবের তৈরি করা ইংরেজি ইস্কুল এইবার সরকারি ইস্কুলের তকমা পেয়েছে। এখন তার নাম বরিশাল জেলা স্কুল। ঘরের নাগালেই একটা ভালো ইস্কুলের খুব প্রয়োজন ছিল। মনে মনে ভাবেন পরেরটি কন্যাসন্তান হলে তাকেও ইস্কুলে পড়াবেন। নিশ্চয়ই ততদিনে মেয়েদের জন্যেও স্কুল তৈরি হবে বরিশাল শহরে। ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে আগে প্রয়োজন পড়াশোনা শেখা। সঠিক শিক্ষাই সঠিক দিশা দেখাতে পারে।

বহু চিন্তা সরিয়ে এল এম এফ পাশ ডাক্তার বনমালী গাঙ্গুলী রওনা হলেন তাঁর নিজের দাওয়াখানায়। অসুখের চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ উপশমের ওষুধ আবিষ্কার এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

(৩)

"বরিশালের নাম কিন্তু প্রথম থেকেই বরিশাল ছিল না"।

"তা তো হতেই পারে। জায়গার নাম তো বদলায়। আগে কী নাম ছিল তবে?"

ইমনের সঙ্গে এক কাপ কফি নিয়ে বসলে তিন-চারটে কথার পরেই ও সোজা বরিশালে চলে যাবে। যত দিন যাচ্ছে, এই প্রবণতা বাড়ছে। প্রথম প্রথম অর্ণব একটু বিরক্ত হত। এখন মানিয়ে নিয়েছে। কোথাও একটা কাঁটা রয়েছে ওর। যন্ত্রণা হয়। তাই নিশ্চই ফিরে ফিরে হাত রাখে। সেই কাঁটার খোঁজ পায়নি অর্ণব। কিন্তু নির্ভরতার উষ্ণ স্পর্শটুকু রেখে দিয়েছে। ওইটুকুর নামই তো সম্পর্ক।

ইমন অর্ণবের দিকে তাকায় একবার। হাতে ট্যাব খোলা।

"আগে বরিশালের নাম ছিল বাকলা। হিউয়েন সাং যখন ভারতে আসেন তাঁর ভার ভ্রমণের বিবরণে এই বাকলার উল্লেখ রয়েছে"।

"তুই বলতে চাস, হিউয়েন সাং বরিশালে গিয়েছিলেন?"

"ডেফিনিটলি গিয়েছিলেন। তখন বাকলা মানে শুধু এইটুকু একমুঠো জায়গা তো নয়। বিশাল সীমানা। বিরাট রাজ্য। সেই দেশকে তখন পণ্ডিতপ্রধান দেশ বলেই উল্লেখ করেছেন হিউয়েন সাং"।

"ওরে বাবা! কী বলছিস রে!"

"ঠিকই বলছি", ইমনের চোখে একটা আলো জ্বলে ওঠে, "একটা ভূগোল বই আছে, সেটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা, তার নাম দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি। এই বইটাতে বাকলার একটা সীমানা দেওয়া রয়েছে"।

অর্ণব নড়েচড়ে বসে। ইমন তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি নিয়ে বরাবর সেনসিটিভ। কিন্তু পিতৃভূমি নিয়ে এতটা ইতিহাস ঘেঁটে ফেলেছে, এটা আশ্চর্য ব্যাপার।

"তুই সংস্কৃত জানিস? আর কী কী পড়েছিস, বল একটু"।

"ফাজলামি করিস না। সংস্কৃত বইয়ের রেফারেন্স দিলেই সংস্কৃত জানতে হবে, কোথায় লেখা আছে? তুই বল দেখি, আবুল ফজলের নাম মনে আছে?"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। কী যে বলিস! ইতিহাসে এত কিছু কাঁচা নই। মাধ্যমিকে প্রচুর নম্বর পেয়েছি ভাই। ওই আবুল ফজল মানেই আইন-ই-আকবরী। ভদ্রলোক সম্রাট আকবরের দরবারে ছিলেন না?"

"একদম ঠিক বলেছিস। ঐতিহাসিক আবুল ফজল। ওনার ওই আইন-ই-আকবরি বইটিতেও কিন্তু বাকলার কথা রয়েছে"।

"ওরে বাবা! কী কাণ্ড!"

"একটা কথা খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখ অর্ণব, বিক্রমপুর, বাকলা আর নবদ্বীপ, সেই সময়ে এই তিনটে জায়গা ছিল বাংলাদেশে কালচারাল হাব। সংস্কৃতির পীঠস্থান। জমজমাট ব্যাপার সব। শিল্পী পণ্ডিত গুণিজনদের ভিড়। কিন্তু তার মধ্যেই বাকলা কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন। বলা হচ্ছে, বাকলাতে বিদ্বজ্জন ছিলেন সবথেকে বেশি"।

"বিদ্বজ্জন ! সেরেছে রে ..."

অর্ণবের দিকে কটমট করে তাকায় একবার ইমন, "ইয়ার্কি মারিস না । একটা সিরিয়াস বিষয়ে কথা হচ্ছে" ।

"এই না না... আমি প্রচন্ড সিরিয়াস । তুই বল । শুনছি ।"

"আমি খুঁজে খুঁজে মধুসূদন সরস্বতী, গৌরীনাথ কূট, হরিনাথ মহামহোপাধ্যায়ের কথা পেয়েছি । এঁদের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতীর রচনা যদি বা পাওয়া যায়, বাকিদের সব লেখা এখন দুস্প্রাপ্য । আর একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিই", ইমন চট করে মোবাইলের নোটপ্যাড খুলে নেয়, "বরিশাল জেলার আরেক নাম ছিল বাখরগঞ্জ । এখন কিন্তু বরিশাল জেলার সদর মহকুমার একটি থানারই নাম বাখরগঞ্জ । ইতিহাস বলছে, ১৭০১ সালে আগা বাকর নামে এক ভদ্রলোক এই জায়গায় থাকতে শুরু করেন । আগা বাকর ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্মচারী । এই আগা বাকরের নামে জায়গাটার নাম হয় বাকরগঞ্জ । তবে, মুসলমান আমলে বাখরগঞ্জ বা বরিশাল নামে কোনও জেলাই ছিল না । যে জায়গাটাকে এখন বরিশাল জেলা বলা হচ্ছে, সেটি একসময় ছিল চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অংশ" ।

"তুই তো পুরো গুলে ফেলেছিস রে !" অর্ণবের কথা ইমনের কান অবধি পৌঁছল বলে মনে হল না ।

"বাখরগঞ্জ জেলার নামকরণ হল ইংরেজদের আমলে । ১৭৬৫ তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা বিহার আর ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেল । দেওয়ানি বলতে যা বোঝায় । ট্যাক্স কালেক্টর । তারপরের গল্প আরও কিছুদিন পরের । ১৭৯৭ তে বাখরগঞ্জ হয়ে যায় আলাদা জেলা । মিডলটন নামে এক সাহেব তখন এই জেলার কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট । তারপরে এলেন উইন্টেক সাহেব । সেই সময় জেলার সদর অফিস বাখরগঞ্জ থেকে চলে যায় কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম পারে । সেই জায়গাটাই বরিশাল । যদিও বরিশাল জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও অনেকদিন অবধি এই জেলা ছিল ঢাকা কালেক্টরির মধ্যে । ইতিহাস বলছে, ১৮১৭ সালে বরিশালে প্রথম কালেক্টরি তৈরি হল । আর সেইজন্যেই এবার মহকুমা তৈরির প্রয়োজন হল ।"

"বলছি, তুই এই ক্লাসটা কতক্ষণ চালাবি? এবার আমি কিন্তু খুব বোর হচ্ছি ।"

অর্ণবের কথায় এতক্ষণে হুঁশ ফেরে ইমনের । অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বকে চলেছে ও । সত্যি কথা বলতে কি, অর্ণবের নিজের দেশের বাড়ি বরিশালে হলেও এই জায়গাটা নিয়ে ওর কখনও কোনওদিন কোনও রকম উচ্ছ্বাস ছিল না । আবেগ তো নয়ই । শুধু তাই নয়, ইমনের এই অতিরিক্ত আগ্রহ নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ বিরক্ত ছিল অর্ণব । এখন এগুলোকে ইমনের খামখেয়ালি মেজাজের একটা ছোট্ট সংস্করণ বলেই ধরে নিয়েছে ।

"আমাকে একবার সব ঘুরে দেখতে হবে রে । অনেক কিছু জানার আছে । আমি নিজে না গেলে কিছুতেই হবে না । কিছুতেই না ।"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় ইমন ।

"কী দেখতে হবে ? কী বলছিস ? কোথায় যাবি তুই ?"

"বাংলাদেশ । বরিশাল জেলা সদর । জেলা স্কুল, কোর্ট, সদর গার্লস, কীর্তনখোলা নদী, লঞ্চঘাট ... অপরাজিতা কুঞ্জ, কাঠপট্টির সেই দোকানটা ... সব দেখতে হবে ।"

ইমনের চোখদুটো অনেক দূরে হারিয়ে যায় । ফ্ল্যাটের জানলা থেকে বিজয়গড় কলেজের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে ওপারের সেই বাংলাদেশ । কাঁটাতার যাকে আজও মন থেকে উপড়ে আলাদা করে দিতে পারেনি । ইমনের

মোবাইলের ছবির গ্যালারিতে সারি সারি সাদা-কালো ছবি। ঝাপসা। ধূসর। কোন যুগের ওপার থেকে তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"তুই কি একেবারে পাগল হয়ে গেলি ইমন?"

"তুইই একমাত্র আমাকে সাহায্য করতে পারিস অর্ণব। তোর দুই কাকা এখনও তো রয়েছেন বাংলাদেশে। প্লিজ অর্ণব, তুই একটু হেল্প করলেই আমি যেতে পারব। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলেই...।"

পদ্মানদীর ওপরে বার্জ পেরিয়ে বরিশাল শহর। নদীর অকূল পাথারে লুটোপুটি করে সেদিন অর্ণবের কাকুতি-মিনতি।

"পৌঁছতে পারলে কী হবে শুনি? খামোখা একটা অলীক ইতিহাসের পিছনে ছুটছিস ইমন। এটা পাগলামি। কবেকার সেই সব লোকজন। দেশভাগের সময় কিছু গেছে। যা কিছু ছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাকিটাও নিশ্চিহ্ন। ওখানে আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। প্লিজ ... বাড়াবাড়ি করিস না।"

সমস্ত লক্ষ্যপূরণ আর কার্যসিদ্ধির মধ্যে কোথাও একটা বাড়াবাড়ি তো থাকেই। ভাগ্যিস থাকে ... নদীর ঘোলা জলে ঝকঝকে রোদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলের পাখি। ইমন বুকভরে শ্বাস নেয় একবার। ওই দূরে দেখা যায় ঘাট। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বরিশাল।

.... ক্রমশ

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় 'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ১০

[পূর্ব কথা – রঘু এবার কালিচক হাইস্কুলে, ইলেভেনের বাৎসরিক পরীক্ষায় সেখানকার অন্য সব ছাত্রদের সাথে বসবার অনুমতি পেয়েছে। আর বীরেশ্বর মাস্টার বলেছেন, চা-ঘর থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে রঘু পরীক্ষার সময় মাস্টার মশাই-এর বাড়িতেই থাকবে। ওখান থেকেই পরীক্ষা দেবে। রঘুর অনুপস্থিতিতে ওর কাজের কিছুটা দায়িত্ব জিতেন দাস বাদলের উপর দিলেন।

পরীক্ষার ক'দিন আগে অঙ্কিত আর রঘু অঙ্ক ক্লাস থেকে ফিরছিল। পথে আনন্দীর সাথে কথা কাটাকাটির মধ্যে বাইরের ক'টা ছেলে এসে রঘুদের সঙ্গে মারপিট শুরু করে দিল। আনন্দীর জন্য মার খেতে হল বলে রঘু তার উপর ভীষণ চটে গেল।

বীরেশ্বর মাস্টারের বাড়িতে থাকার সময় মাস্টারমশাই এবং তাঁর স্ত্রীর স্নেহের মধ্যে রঘু বহুদিন বাদে ঘরের স্বাদ ফিরে পেল।]

দরজা খুলে রঘু একটু থমকে গেল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন অতি সুদর্শন ভদ্রলোক। কালো ফ্রেমের চশমার পিছনে উজ্জ্বল দুটি চোখ। পরিপাটি ব্যাকব্রাশ করা চুলে সাদার ছোঁয়া লেগেছে। সযত্ন লালিত গোঁফটিও তাই। দেখে মনে হয় – বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ-এর কাছাকাছি। ভদ্রলোকের হাতে একটা লাঠি। তবে রঘু কিন্তু ওনাকে দেখে থমকায়নি। আসলে ভদ্রলোকের পাশেই দাঁড়িয়েছিল আনন্দী, আর তাকে দেখেই রঘু থমকে গেল। ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন – 'বীরেশ্বর মাস্টারমশাই বাড়িতে আছেন?'

রঘু দরজার পাল্লা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বলল – 'আসুন!'

ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে মাস্টার মশাই আগত মানুষটিকে দেখে নিয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন – 'আরে, নিখিলেশ! এসো, এসো। কালিচকে কবে এলে? সঙ্গে এটি কে?'

ভদ্রলোকটি, মানে নিখিলেশ ঘরে এসে বসলেন – সঙ্গে সঙ্গে আনন্দীও। নিখিলেশ বললেন – 'দু-দিন আগে এসেছি। এটি আমার ভাগ্নি। আগেও দেখেছেন, তখন ছোট ছিল।'

– ও হো, সেই বাচ্চা মেয়েটা! এত বড় হয়ে গেছে! কি পড়ছ তুমি?

হাসিমুখে আলাপ-সালাপ চলতে লাগল। এদিকে আনন্দীকে দেখেই রঘুর মন মেজাজ একদম খারাপ হয়ে গেল। ক'দিন আগের সেই রাস্তায় মারপিটের ঘটনা, আনন্দীর অপমান-জনক কথাবার্তা, এ সব মনে আসতেই সব কিছু তেতো লাগতে শুরু করল। একপাশে বসে থাকা বীরেশ্বরবাবুর স্ত্রীকে গিয়ে বলল – 'আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি মাসীমা? মাথাটা ধরে আছে!'

কারোকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রঘু বেরিয়ে গেল। শুনতে পেল পিছনে মাসীমা বলছেন – 'ওমা, এই তো বেশ গল্প করছিলি, হঠাৎ মাথা ধরল কেন?' কিন্তু ততক্ষণে রঘু বেরিয়ে গেছে। আনন্দী ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে "আমি একটু আসছি" বলে রঘুর পিছন পিছন বেরিয়ে গিয়ে কয়েকবার জোরে জোরে ডাকল – "রঘুনাথ! রঘু! একটু দাঁড়াও, একটা কথা আছে!"

কিন্তু রঘু দাঁড়ালো না, আর আনন্দীর কথা শুনেও শুনল না। হনহন করে হেঁটে সে এগিয়ে গেল। আনন্দী ঘরে ফিরে এল। নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করলেন – 'তুই ওকে চিনিস?'

– “হ্যাঁ, ইংলিশ কোচিং ক্লাসে একসাথে পড়ি !” আনন্দী উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল।

নিখিলেশ বীরেশ্বর মল্লিকের দিকে তাকালেন – ‘মাস্টার মশাই, ছেলেটা কি আপনার আত্মীয় ? না কি ছাত্র ? এখানেই তো থাকে বলে মনে হল !’

বীরেশ্বর বাবু হাসতে হাসতে বললেন – ‘দুটোই বলতে পার !’

এরপর তিনি রঘুর সম্বন্ধে আগাগোড়া সব কথাই বলতে শুরু করলেন। একটি অনাথ বালকের পড়াশোনা করার তীব্র ইচ্ছার কথা, তার জীবন যুদ্ধের কথা বলতে বলতে কথার মধ্যে রঘুকে নিয়ে তাঁর প্রচ্ছন্ন গর্বটা চাপা রইল না ! নিখিলেশও আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতে বলে উঠলেন – ‘কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ! যদি দরকার হয় বলবেন মাস্টার মশাই। এরকম একটি ছেলেকে কোনো ভাবে কিছু সাহায্য করতে পারলে আমি খুব খুশি হব !’

আনন্দী রঘুর ব্যাপারে কিছুটা জানত। কিন্তু সবটা নয় ! প্রথমে, রঘুর কথা শোনার কোনো ইচ্ছেও ওর ছিল না। কিন্তু মাস্টার মশাই-এর মুখে রঘুর ছোটবেলার সব গল্প শুনতে শুনতে কখন যেন ও নিজের অজান্তেই কৌতূহলী হয়ে আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেল !

আনন্দীকে এড়াতে মাস্টার মশাই-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিয়ে বেশ খানিকটা যাবার পর রঘুর হঠাৎ মনে হল – সে যাচ্ছে কোথায় ? চা-ঘরে তো সে আজ ফিরবে না। তাহলে সে এখন কোথায় যাবে ? তার বন্ধু বান্ধবও তেমন নেই যাদের সাথে আড্ডা দেওয়া যায়। এক অঙ্কিত রয়েছে। কিন্তু আজ বোনকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্কিতের কোথাও বেড়াতে যাবার কথা। কাজেই ওকেও পাওয়া যাবে না। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রঘু সামনের তেকোনা পার্কটায় ঢুকে পড়ল। এই পার্কে গাছপালা তেমন নেই। কিন্তু দুটো বেঞ্চি আছে। একটাতে দুজন বয়স্ক মানুষ বসে কথা বলছিল। রঘু অন্যটাতে গিয়ে বসল। বেঞ্চের পাশে একটা কুকুর শুয়েছিল। রঘুকে একবার মাথা তুলে দেখে নিয়ে আবার আগের মতই শুয়ে রইল।

পড়ন্ত বিকেলে ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছিল। মনটা কেমন খারাপ লাগছিল রঘুর ! নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরকম মন খারাপকে রঘু প্রশ্রয় দিতে চায় না। সে মোবাইল বার করে বকুলকে ফোন করল।

বকুল তখন ভীষণ খুশির মুডে ছিল ! রঘু ফোন করতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল – ‘তোর সাথে অনেক কথা আছে। ফোন করে খুব ভালো করেছিস।’ বকুল বলে চলল – ও আর প্রমোদ খুব ভালো আছে এখন। ওরা একটা দু কামরার ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করেছে। সেখানেই দুজনে আছে আর একটু একটু করে সংসার গোছাচ্ছে। প্রমোদ বম্বেতে একটা খুব ভালো কাজ পেয়েছে। কাজটা শেষ হতে মাস কয়েক সময় লাগবে। প্রমোদ কাজটা সেরে ফিরে আসার পরই ওরা দুজনে একসাথে কালিচকে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। বিয়ের দিনও তখনই ঠিক করা হবে। বিয়ের ব্যাপারে ওরা আর বেশি দেরী করতে চায় না – ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক কথা বলে গেল বকুল ! ফোনটা রেখে দেবার পর রঘুর মনটা যেন আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। বকুলের জন্য ও খুশি হতে চেয়েও কেন যেন ঠিক খুশি হতে পারছিল না !

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বয়স্ক মানুষ দুজন খানিক আগেই চলে গেছে। দুটি কম বয়সী ছেলে মেয়ে এসে খালি বেঞ্চিটায় বসল। রঘুর মাথার উপর বেশ কিছু মশা ঘুরছিল। দু একটা ওকে কামড়েও দিল। রঘু উঠে দাঁড়াল। ও যখন মাস্টার মশাইএর বাড়িতে ফিরে এল, তার একটু আগেই আনন্দীরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।

পরদিন চা-ঘরে ফিরে আসার পর রঘুর মনে হল, কোথায় যেন একটু অন্যরকম লাগছে ! দুপুরে দোকান তখন ফাঁকা। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। বিরজু চুপচাপ এসে রঘুর পাশে বসে বলল – ‘রঘুদাদা, তুমি তো ছিলে না। একটা বেপার হয়েছে !’

বিরজু খুব নীচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে রঘুকে জানাল যে তার অনুপস্থিতিতে রাতে দোকান বন্ধ করে চা-ঘরে জুয়া খেলা হত ! বাদল বলেছে – পুলিশ খবর পেলে নাকি খুব খারাপ হবে ! দোকানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে ! কারোকে জানাতেও বারণ করেছিল। কিন্তু বিরজুর খুব ভয় হচ্ছে, তাই সে শুধু রঘুদাদাকেই এটা জানাল !

রঘু গম্ভীর হয়ে গেল। বিরজুকে আশ্বস্ত করে বলল – 'আমাকে বলে ভালো করেছিস। কিন্তু এটা নিয়ে আর কারো সাথে আলোচনা করিস না।'

রঘু ভাবতে লাগল, কি করা যায় ! ও না থাকলেই চা-ঘর যদি জুয়ার আড্ডা হয়ে যায় তবে তো ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। মুস্কিল হল, জিতেন দাসকেও একথাটা বলা যাবে না। কারণ, তাতে জুয়া খেলা বন্ধ হবে ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে মুরারীর চাকরি তো যাবেই, নিতাই, বাদল এরাও সব বিপদে পড়বে ! কারণ এরাও সব ওই দলে আছে ! মাথায় একটা বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত চুপচাপ থাকাটাই সে সমীচীন বলে মনে করল।

কয়েক দিন বাদে বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেরোল। নতুন ক্লাসের পড়াশোনার সাথে সাথে টিউশন ক্লাসও আবার শুরু হল। টীচাররা ছাত্রছাত্রীদের আরো ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহ দিলেন! অঙ্কের সুজয় স্যার রঘুকে ডেকে বললেন – 'তোমার রেজাল্ট জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি ! কালিচক হাইস্কুলের অংকের টীচার আমাকে বলেছেন যে তুমি অঙ্কে ৯০% নম্বর পেয়েছ। চেষ্টা চালিয়ে যাও; উচ্চ মাধ্যমিক এ আরো ভালো করবে। আর একটা কথা, তোমাকে এই বছরটা আমি ফ্রী করে দিলাম। তোমাকে কোনো টিউশন ফী দিতে হবে না !'

সুজয় স্যারের কথায় রঘু একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে একটুক্ষণ ওনার দিকে চেয়েছিল। তার পর টিপ করে একটা প্রণাম করে বলল – 'আমি ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য সাধ্যেমত চেষ্টা করব, স্যার !'

অঙ্কক্লাসে রঘুর দাম বেড়ে গেল। অনেকেই রঘুর সাথে একটু বেশি বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতে লাগল। অঙ্কিতও খুব খুশি। ওর নম্বরটাও খারাপ হয়নি। আর রঘুর সাফল্যে সেও যেন গর্বিত ! রঘুকে সে সত্যিই ভালোবাসে। আরো বেশি ভালোবাসে এই কারণে যে এই বন্ধুটি তার পাশে দাঁড়ানোর পর থেকে অঙ্কিতের জীবনটাই অনেক পাল্টে গেছে। তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। এখন আর সে বাবাকে ভয় পায় না ! বাড়িতে মা, ছেলে-মেয়ে একজোট হয়ে যাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে রঘু ওদের সাথে থাকায় অঙ্কিতের বাবারও নেশা করে বাড়ি এসে চোটপাট করাটা একদম কমে গেছে !

অঙ্কক্লাসে গিয়ে যতটা ভালো লাগছিল রঘুর, ততটাই খারাপ লাগছিল ইংরেজি ক্লাসে যেতে। তার কারণ এই নয় যে সে ইংরেজিতে ভালো নয় ! টিউশনির গুণে এবং নিজেও যথেষ্ট খাটা-খাটনি করার ফলে ইংরেজিতেও সে মোটামুটি ভালো নম্বরই পেয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল তার আনন্দীকে নিয়ে ! মেয়েটা অকারণে তার পিছন লাগে, অপমান করে। আর সেদিনের সেই রাস্তার ঘটনাটার পর থেকে ওর কথা মনে হলেই রঘুর একেবারে পিত্তি জ্বলে যায় ! কিন্তু ইংরেজি টিউশন তো নিতেই হবে তাকে। রঘু মনস্থির করে – আনন্দীকে সে – মোটেই পাত্তা দেবে না। যা খুশি করুক ও – রঘু সেই দিকে তাকিয়ে দেখবেও না, শুনবেও না। কথা বলার তো কোনো প্রশ্নই নেই ওঠে না!

ছুটির পর প্রথম দিনের ইংরেজি ক্লাসটাও ভালোই হল। বারো ক্লাসে উঠে ছেলেমেয়েদের সবার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা ! স্কুলের শেষ বছর, এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তারা, তার পরেই কলেজ ! কার কেমন রেজাল্ট হবে, কে কি পড়বে, এসব নিয়ে কত রকমের জল্পনা, ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ, ভয়, রোমাঞ্চ – সব একসাথে !

ক্লাস শেষে রঘু চা-ঘরে ফিরছিল, বড় রাস্তার মোড়ের কিছুটা আগে আনন্দী এসে রঘুর পথ আটকে বলল – 'তোমার সাথে আমার কথা আছে।' রঘু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আনন্দী দুহাত ছড়িয়ে একেবারে রঘুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল – 'বললাম না, কথা আছে !' রঘু অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীরভাবে বলল – 'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না !'

আনন্দী চেঁচিয়ে উঠল – 'এই জন্য, শুধু এই জন্যই আমি তোমাকে সহ্য করতে পারি না। এত অহংকার তোমার ! কি মনে কর নিজেকে ?'

যুগপৎ বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ রঘু এবার সোজাসুজি আনন্দীর দিকে তাকাল – 'মানে ? এ কথার মানে কি ? অহংকার ! আমার ? বড়লোকের মেয়েরা দামি জামা-কাপড় পরে, দামি গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবে, হাতে মাথা কাটবে সকলের, আর সেটা মেনে না নিলেই – অহংকারী !'

মাথা নামিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আনন্দী বলল – 'দ্যাখ রঘুনাথ, আমি আজ রাগারাগি করতে আসিনি। আমি জানি, আমি অন্যায় করেছি। আমি তোমায় শুধু শুধু অপমান করেছি !'

রঘু আনন্দীকে কথাটা শেষ করতে দিল না। শ্লেষের সাথে বলে উঠল – 'না না, তোমার আবার অন্যায় কিসের ? আমি চায়ের দোকানের ছোট্টু, আমার আবার মান অপমান !'

– 'প্লীজ, প্লীজ রঘুনাথ ! আমি ক্ষমা চাইছি।' দু-হাত জোড় করে ক্ষমা চায় আনন্দী। 'তুমি জানো না রঘুনাথ, দোলের আগের সেই ঘটনার পর থেকে আমি কী ভীষণ অপরাধ বোধে ভুগছি !'

– আনন্দীর ব্যবহারে রঘু একটু অবাক হল, কিন্তু ওর কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। ঠাট্টার সুরে বলল – 'চায়ের দোকানের ছোট্টুর সাথে এটা কি তোমার নতুন রকমের তামাসা ?'

একটু দূরেই আনন্দীর গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। সে একবার মুখ ঘুরিয়ে তার গাড়িটা দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বলল – 'একটা কথা বলব ? তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না ! আসলে, আমি তোমাকে ভীষণ রকমের হিংসে করি !'

– 'আমাকে হিংসে কর ?' রঘু যেন আকাশ থেকে পড়ে। 'কেন ? আমার মত অনাথ, গরীব একটা ছেলেকে হিংসে ? তাও আবার তোমার মত একটা মেয়ে !'

– 'আমি জানতাম, তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা সত্যি। তুমি অনাথ, তোমার টাকা পয়সা নেই – এসব আমি জানি ! কিন্তু তোমার এমন অনেক কিছু আছে, যা আমার একটুও নেই।'

– 'মানে ?' রঘুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

– 'তুমি জানো না রঘু তোমার কত কিছু আছে! সব চেয়ে বড় কথা – তুমি একেবারে স্বাধীন। তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পার। তোমার এই জীবনটার মালিক শুধু তুমি। এটা যে কত বড় কথা, তা তুমি জান না !'

– 'না, সত্যিই জানি না। কেন, তোমার জীবনের মালিক তুমি নও ?'

– 'একেবারেই নই !' আনন্দীর কথায় রাগ, বিতৃষ্ণা, হতাশা সব ছিটকে ছিটকে বেরোয়। 'আমি কখন কোথায় যাব, কার সাথে মিশব, কি পড়ব – সব কিছু অন্যর ইচ্ছেতে হয়। আমার জীবন আমার ইচ্ছেতে চলে না। তার নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে; বিশেষ ভাবে আমার বাবার হাতে।'

– 'তোমার ভালোর জন্যই করেন।'

– 'ভালো ! মাই ফুট ! সারাক্ষণ শুধু – এটা করো, ওটা কোরো না। ওখানে যাও, সেখানে যেও না' – অসহ্য লাগে আমার ! তাই তোমাকে দেখলে রাগ হয় আমার, ভীষণ হিংসে হয়।'

এবার করুণ একটা হাসি ফুটে ওঠে রঘুর মুখে। আনন্দীর গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলে – 'তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়ি যাও।'

আনন্দী একটু 'কিন্তু কিন্তু হেসে' ডান হাত টা বাড়িয়ে দিয়ে বলল – 'তা হলে, এবার থেকে আমরা ফ্রেন্ড?'

রঘুও হেসে ফেলল। আড়ষ্ট হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল – 'আচ্ছা, ফ্রেন্ড।'

রমা জোয়ারদার — দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১০

শীত এসে যাচ্ছে কলকাতায়। উত্তরে হাওয়া এখন নিয়মিত কড়া নাড়ে শহরের দরজায়। দিন ছোট হয়ে আসায় সূর্যের কাজ কমেছে। বিকেল বিকেলই ঘরে ফিরতে পারে সে। কলকাতা শহরের সংকীর্ণ গলিগুলো এই সময় ল্যাম্পের হালকা আলো আর কুয়াশা মিলিয়ে কেমন ঝাপসা হয়ে থাকে। অবশ্য দূষণে ভরা এই মহানগরে এখন কুয়াশার চারণভূমি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। পিছু হঠতে হঠতে এখন সে কলকাতা ময়দানেই মূলতঃ আশ্রয় নিয়েছে। উত্তর কলকাতার গলি খুঁজিতে আদতে ধোঁয়াশার প্রভাবই বেশী। সেই ঝাপসা সন্ধ্যা ঠেলে এসে বাড়ির বেলটা বাজালো কলেজ ফেরত শিঞ্জিনি।

বসবার ঘরে বাবা, মা-র সঙ্গে বসে কথা বলছে তারই বয়সী একটি সুদর্শন ছেলে। দোহারা চেহারা, ঈষৎ শ্যামবর্ণ ছেলেটি বেশ বিনম্রভাবে শুনছে বিমলের কথা।

— ''আয়, মা আয়। আলাপ করিয়ে দিই। এ হল তমাল, তমাল রায়, আমাদের বাঁশবেড়িয়ার কনকের ছেলে রে! ওহ! কনককে বোধহয় তোর মনে নেই। আমার বাল্যবন্ধু। তমাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হয়েছে, এই পাড়ায় নর্দান অ্যাভিনিউ এ ওর মাসির বাড়ি থেকে পড়াশুনা করছে আজ দেখা করতে এসেছে। তমাল এই আমার মেয়ে শিঞ্জিনি বাংলা অনার্স নিয়ে পার্ট টু করছে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যান বিমল

— ''নমস্কার'', বেশ সুন্দর উচ্চারণে তমাল সম্ভাষণ করে ওঠে দু'হাত জড়ো করে।

শিঞ্জিনি বসে যোগ দেয় সেই আলোচনায়। মূলতঃ গল্পই হতে থাকে বাঁশবেড়িয়ার। একটু পরে বিমল বলে ওঠেন, ''তমাল, আমাকে যে এবার একটু বেরোতে হবে বাবা। তুমি কিন্তু রাত্রে খেয়ে যাবে। ছোটকু, মা তো রান্নায় ব্যস্ত হয়ে যাবে, তুই একটু তমালের সঙ্গে গল্প কর। ওকে তোর ঘরে নিয়ে যা বরং''।

শিঞ্জিনির ঘরে এসে তমাল প্রথমেই চলে গেল বই এর আলমারি কাছে খুব মন দিয়ে যেন দেখছে সে বইগুলোকে।

''আপনি তো শুনলাম বাংলার ছাত্রী। কিন্তু নানা বিষয়ে আগ্রহ রাখেন দেখছি'', ঘাড় ঘুড়িয়ে তমাল বলে ওঠে।

— ''হ্যাঁ, বই আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী'', শিঞ্জিনি উত্তর দেয়

— ''আমারও। আচ্ছা, আপনি ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার পড়েছেন?''

— ''না, শুনেছি বইটার কথা, পড়া হয়নি''।

— ''পড়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। সাধারণ মানুষদের কথা কিভাবে লেখা আছে ওতে দেখবেন। আচ্ছা আপনার এরপর কি করবার ইচ্ছা?''

— ''ইচ্ছা তো P.hD করে অধ্যাপনা করবার, দেখা যাক'', মৃদু হেসে জবাব দেয় শিঞ্জিনি।

আস্তে আস্তে বেশ গল্প জমে ওঠে দুজনের। শিঞ্জিনির বেশ ভালো লাগে তমালকে। কথাবার্তা শুনলে বোঝা যায় বেশ রুচি আছে ছেলেটির। তমালের ও বোধহয় ভালো লাগছে কথা বলতে। বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে।

সে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে যাওয়ার সময় তমাল শিঞ্জিনিকে একা পেয়ে প্রশ্ন করে, ''কফিহাউসে যাও নাকি?'' ততক্ষণে ওরা তুমিতে নেমে এসেছে।

— ''না, নিয়মিত নয়, ওই দু'একবার গেছি আর কি ?'' শিঞ্জিনি জানায় ।

— ''কাল আসতে পারো একটা নাগাদ ?''

— ''কেন ?''

— ''চমক আছে একটা, এসো Please''

— ''আচ্ছা ।''

সে রাত্রে শিঞ্জিনি বোঝে তমালের প্রতি তার মনে একটা ভালো লাগা তৈরী হয়েছে । হয়তো তার গঠনটা খুবই কাঁচা, তবু নরম একটা ভাব টের পায় সে । তমালের চোখে, আচরণ — কথায় সে ও তমালের দিক থেকে একটা সাড়া অনুভব করেছে । শিঞ্জিনি স্থির করে, সে যাবে কাল কফিহাউসে ।

পরের দিন ঠিক একটায় শিঞ্জিনি পৌঁছে যায় কফিহাউসে । গমগম করছে গোটা হল ঘরটা । তারই ফাঁকে এক কোণে একটা ছো টেবিল দখল করে তমাল বসে আছে ।

— ''এসো, এসো বসো'' — সাগ্রহে উঠে দাঁড়ায় তমাল ।

শিঞ্জিনি বসে, খেয়াল করে তার দিকে তমাল পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছে । অস্বস্তি এড়াতে সে প্রশ্ন করে, ''কি একটা চমক আছে বলছিলে''?

— ''হ্যাঁ, চমকটা হল এই যে আজ আমার জন্মদিন আর আমার জন্মদিনের পার্টিতে তুমি স্বাগত''।

— ''ওমা তাই ! শুভ জন্মদিন ! কিন্তু পার্টির অন্য অতিথিরা কই ?'' — ''আর কেউ নেই, শিঞ্জিনি, তুমিই একমাত্র'', গভীর কণ্ঠে তমাল বলে ওঠে ।

হঠাৎ লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয় শিঞ্জিনি । তমাল তাকে বলে, শিঞ্জিনি, আমি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে । বেশ কষ্ট করেই বাবা মা মানুষ করেছে আমাকে । মফঃস্বলের ছেলে শহুরে রীতি-নীতি জানিনা, তাই কোন কথা ঠিক কেমন ভাবে বলতে হয় জানিনা । তবু বলছি, আমার তোমাকে ভালো লেগেছে শিঞ্জিনি, তুমি আমার বন্ধু হবে ?''

শিঞ্জিনির বুকের ভিতরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে । সে কোনও রকমে চোখ তুলে বলে, ''হ্যাঁ''।

সেদিন কফিহাউসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে তারা । তারপর শেষ দুপুরে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে বসে কলকাতা ময়দান । তমাল কথা বলে যেতেই থাকে, শিঞ্জিনি একদৃষ্টে দেখতে থাকে বিদায়ী সূর্যকে । তার মন আজ শিহরিত । তবে কি কাম্য ভালোবাসা এল তার জীবনে ? যবে থেকে বোধের উন্মেষ হয়েছে, তবে থেকে শিঞ্জিনি পাগলের মতো ভালোবাসা খুঁজে বেড়িয়েছে । ভালোবাসাই ঈশ্বর তার সঙ্গে সেই ঈশ্বর কি দেখা দেবেন তাকে সত্যিই এবার ? শিঞ্জিনি বিভোর হয়ে ভাবতে থাকে ।

— ''আচ্ছা, শিঞ্জিনি, তুমি সাজো না কেন একদম ? কাল দেখলাম আজও, এত কম সাজো কেন তুমি ?'' তমালের প্রশ্নে ঘোর কাটে শিঞ্জিনির ।

— ''দুর! ভালো লাগেনা অত সাজতে ।'' সরল বালিকার কণ্ঠে সে উত্তর দেয় ।

''না, না, একটু সাজবে । না সাজলে মেয়েদের দেখতে ভালো লাগেনা । আই, তুমি অত দূরে বসে আছো কেন ? কাছে এসো না একটু'', তমাল বলে ।

''আজ থাক, লজ্জা করছে'' শিঞ্জিনি দ্রুত বলে ওঠে।

''ঠিক হ্যাঁয়। তাই সই'' ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তমাল বলে।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে পড়ে তারা। সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে কলকাতার বুকে ততক্ষণে।

সে রাত্রে শিঞ্জিনি বিছানায় শুয়ে তমালের কথা ভাবতে থাকে। বোঝে, তমালের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে। শিঞ্জিনি বোঝে যে সে খুব দুত জড়িয়ে পড়ছে সম্পর্কটায় মানসিকভাবে। তমালকে বেশ ভালো লাগছে তার। শুধু একটা কথাই শিঞ্জিনির মনের কোণে খচখচ করতে থাকে। সাজগোজ, দৈহিক নৈকট্য নিয়ে যেন একটু বেশী আগ্রহ তমালের। এগুলোর সঙ্গে তো ভালবাসার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে কি ভালোবাসা সম্পর্কে ধারণায় তফাত আছে তাদের দুজনের চিন্তাধারায় ? হঠাৎ নীলকে মনে পড়ে যায় তার। নীল কিন্তু বাইরের রূপটাকে এত গুরুত্ব দেয়না। শিঞ্জিনি বাজি ধরে বলতে পারে। না না আজ নীলের কথা থাক। আজ তমালের কথা। তমাল তার জীবনে প্রথম ভালোবাসা। ও'টুকু ধারণায় তফাত তো হতেই পারে। এই বয়সের কোনও ছেলের তো ও'টুকু মনে হতেই পারে। আবার তমালের চিন্তায় ডুবে যায় শিঞ্জিনি। হঠাৎ মনে মনে বলে ওঠে, ''তমাল, আমি তোমাকে ভালোবাসি''। নিজেই লজ্জা পেয়ে যায় সে, মনের কোণে এক অদ্ভূত ভালো লাগা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রাসবিহারী মোড়টা সকাল এগারোটায় যেন মানিকতলার মাছের বাজারের চেয়েও সরগরম হয়ে থাকে। অন্ততঃ তথাগতের তো সেরকমই লাগে। একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আওয়াজে আওয়াজে যেন মাথা ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঠিক আজ যেমন হচ্ছে। পূজার আসবার কথা ছিল সাড়ে দশটায়। এমনিতে একটু দেরী করে আসবার অভ্যাস আছে পূজার, কিন্তু আজ যে একটু বেশীই দেরী করছে। তাদের এগারোটার মধ্যে কামালগাজি পৌঁছনোর কথা ছিল। যা বোঝা যাচ্ছে, পূজা যদি এখন ও এসে পৌঁছেয়, সাড়ে এগারোটার আগে পৌঁছনো যাবেনা সেখানে।

তথাগতের কোথাও দেরী করে যাওয়াটা অসহ্য লাগে। কিন্তু পূজাকে সে আজও সুধরে উঠতে পারেনি তাদের মধ্যেকার এই তিন বছরের সম্পর্কে।

তথাগত পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, যাদবপুর থেকে পাশ করে এখন সেখানেই অধ্যাপনা করে। কৃতি ছাত্র ও গুনী অধ্যাপক বলে বেশ সুনাম আছে তার। তিরিশ ছুঁই ছুঁই তথাগতর সাহিত্যচর্চার ঝোঁক ও আছে বেশ। রাজনীতিতেও তার আগ্রহ প্রবল। ছাত্রজীবনে একটা সময় সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতি করেছে সে। পূজা ইকোনমিক্সে M.Sc করে এখন P.hD করছে। তথাগতর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছরের প্রেমের সম্পর্ক তার সে মিষ্টি, আদুরে ধরণের মেয়ে। তথাগতর লেখালেখি, রাজনীতিতে সে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করে না। তার আগ্রহ ছবি আঁকাতে। আজ তাদের যাওয়ার কথা পূজার মাসতুতো দিদি ভারতীদির বাড়ি। ভারতীদি সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তথাগতর কি একটা লেখার প্রয়োজনে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু মতামতের প্রয়োজন। তাই আজ তাদের কামালগাজি যাত্রা। দুজনের সম্পর্কের কথা আত্মীয়-বন্ধু মহলে আর কারও অজানা নয়।

কামালগাজি পৌঁছতে পৌনে বারোটা হয়ে গেল। ভারতীদি দরজা খুলেই বললেন, ''কি হল প্রেমিকযুগল, এত দেরী কেন ?''।

— ''এই যে পূজাদেবীর অভ্যাস জানেন তো, ঠিক সময়ে কথামত পৌঁছনোটা ওনার ধাতে নেই'', হালকা চালে উত্তরটা দিতে দিতে ঘরে ঢোকে তথাগত। পিছন পিছন ছদ্ম রাগ দেখাতে দেখাতে পূজাও।

ভারতীদি অবিবাহিতা মানুষ একাই থাকেন ফ্ল্যাটে। আজ অবশ্য তার বসবার ঘরে বসে আছেন আরেক মহিলা যাঁকে পূজা চেনেনা। ভারী ব্যক্তিত্বময়ী চেহারা ভদ্রমহিলার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, সাজে বাহুল্য নেই, একটা হালকা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছেন, প্রসাধন নেই বললেই চলে। মাথার যে চুলগুলো পেকে গেছে ইতিমধ্যেই, তাদের তেমনই থাকতে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দেখলেই সম্ভ্রম হয়।

''আমার বন্ধু, অনেকদিন বিদেশে ছিল, প্রায় ১৫-১৬ বছর। বছর কয়েক হলো ফিরেছে '', কথাগুলো বলেই ভারতীদি ভদ্রমহিলাকে বললেন, ''এই দ্যাখ, এটা পূজা আমার মাসতুতো বোন, আর ও তথাগত, ওরই আসবার কথা তোকে বলছিলাম''।

আবার শুরু করেন ভারতীদি, ''হ্যাঁ, তথাগত, বলো, তুমি কি জানতে চাও ?'' এই পূজা, তুই বরং ভিতর থেকে চার কাপ চা করে নিয়ে আয় তো।

তথাগত বলে, ''দিদি, আসলে একটা প্রবন্ধ লিখি একটি পত্রিকার জন্য। বিষয়টা হল আজকের সমাজজীবনের উপর রাজনীতির প্রভাব।'' তো মোটামুটি একটা খাড়া করে ফেলেছি, কিন্তু তুমি তো জানো, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে কি ঘটে গেল। জঙ্গলমহলে কি ঘটছে। কাজেই বলা যেতে পারে, আজকের রাজনীতির সব চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলোর প্রভাব সমাজে বিশালভাবে পড়ছে। কিন্তু ভূমিকা মূলতঃ অস্ত্র ভিত্তিক, নৈরাস্যভিত্তিক, হিংসা ভিত্তিক। এর সত্যিই কতটা প্রয়োজন আছে বলে তোমার মনে হয় সমাজ বদলাতে ?

ভারতী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ''দ্যাখো তথাগত, আমি ব্যক্তিগত ভাবে বামপন্থায় বিশ্বাস করিনা। আমার মনে রাজনীতি খুব একটা ছাপ ফেলেনা, সত্যি বলতে কি একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আমি মনে করি যে যদিও রাজনীতি সমাজেরই অংশ, তবু আজ রাজনীতির নামে যা চলছে, তা সমাজের পক্ষে খুব একটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না''।

''কিছু মনে করবেন না ভাই, মাঝপথে কথা বলে ফেললাম। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, শহরে বসে জঙ্গলমহলের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যায়না''।

— ''তুই এত জানলি কিভাবে রে ?'' ভারতী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন।

— ''কারণ আমি সেখানে গেছি ভারতী। আমি জঙ্গলমহলে গেছি, সেখানে দিনের পর দিন আদিবাসীদের মধ্যে থেকেছি। আমি দেখেছি আজও মানুষগুলো কি কষ্টের জীবন যাপন করে''।

— ''তুই গেছিস ওখানে ?''

— ''হ্যাঁ জানিস তো আমার বর বড্ড বড় চাকুরে, আমার জন্য সময় নেই তার অবশ্য আমার কোনও কিছুতে বাধা দেয়না সে। ছেলেটাও বড় হয়ে গেছে এই তো I.C.S.C দিল। তাই, কিছু করবার তাগিদে একটা N.G.O তে জয়েন করেছিলাম (যোগ দিয়েছিলাম)। প্রথম প্রথম কলকাতার বস্তিগুলোতে কাজ করতাম। তারপর পাঠালো জঙ্গলমহলে। গিয়ে দেখলাম কি অবস্থা। মানুষগুলো ভালো করে খেতে পায়না। পানীয় জলটুকু আনতে মাইলের পর মাইল যেতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল ওখানকার মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দিতে। অনেক কথা হত ওদের সঙ্গে। দেখতাম, কি প্রচন্ড রাগ ওদের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক দলগুলোর যে তারা হাতের পুতুল তা ওরা বোঝে, কিন্তু প্রতিবাদের শক্তি কোথায় ?

''আপনি জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের সাহায্যকারিদের সঙ্গে মিশেছেন ?'' পূজা চা হাতে এসে অবাক প্রশ্নটা ছোঁড়ে।

— ''হ্যাঁ'', স্মিত হেসে আবার বলেন ভদ্রমহিলা, ''আমি দেখেছি, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহায্যকারিরা একটা আদর্শের জন্য লড়ছে। ভারতী তোরাই বলনা, একটা আদর্শ ছাড়া গ্রামে জঙ্গলে দিনের পর দিন মানুষ কেন পড়ে থাকবে ? এতদিন ধরে সরকার এইসব অঞ্চলের জন্য কিছু করেনি বলেই না সাহায্যকারিরা মাথা তুলেছে। আমি এই বিশিষ্ট সাহায্যকারিদের দেখেছি তারা নৈশ বিদ্যালয় চালাচ্ছে যাতে গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাদের রাজনৈতিক মতামত মানা না মানা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের উচ্চাশা আর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না।''

— ''হ্যাঁরে, তুই ই তো তাহলে তথাগতকে একটু সাহায্য করতে পারিস ওর প্রবন্ধের ব্যাপারে'', ভারতী বলে ওঠেন।

''হ্যাঁ, দিদি, আপনি একদিন যদি সময় দিতেন।'' তথাগত অনুনয় করে।

— ''বেশ তো আমার নম্বরটা নিয়ে নিন ''বলে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে দেন ভদ্রমহিলা। ফোন করে চলে আসবেন, সাউথ সিটিতে থাকি আমি দেখবেন ফ্ল্যাটের বাইরে দত্তা বলে নেমপ্লেট আছে।''

রাস্তায় বেরিয়ে তথাগতের খেয়াল হয় ভদ্রমহিলার নম্বরটা সে চটজলদি হাতে টুকে নিয়েছে বটে, কিন্তু নামটা জানা হয়নি। পূজাকে বলতেই সে উড়িয়ে দিল সমস্যাটা। ''আরে শুনলেনা, বলল ফ্ল্যাটের বাইরে দত্তম লেখা আছে। মিসেস দত্ত বলে সেভ করে রেখে দাও''।

— ''অগত্যা'', বলে তথাগত হেসে ওঠে।

কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি সোমদত্তর। আসলে, ধীরে ধীরে বয়স বাড়ছে তো, চল্লিশের কোঠায় এসে সোমদত্ত দেখেছে মাথার মধ্যে কোনও কারণে উত্তেজনা থাকলে ঘুম আসতে চায়না। আজ রবিবার। অন্যান্য রবিবারে সকাল সাতটার আগে বিছানা ছাড়েনা সে। কিন্তু আজ সোমের সাড়ে পাঁচটাতেই ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুমটা এলোই প্রায় রাত দেড়টার পর। সোমের ফ্ল্যাটটা থেকে শহরের দিগন্তরেখা চোখে পড়ে। ঘিঞ্জি শহরটার যে একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতি রয়েছে, ঐ শহরের আনাচে-কানাচে ও যে সবুজ ছড়ানো আছে, ভোরের সূর্য এসে সস্নেহে ছুঁলে যে এ কংক্রীটের শহরের চেহারাটাও নরম হয়ে ওঠে, সেটা সোম বুঝতে পারে ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়ালে। কিন্তু আজ এ'সব কিছুই নজরে পড়ছে না তার। মনটা তেতো হয়ে আছে কাল থেকেই।

কাল হঠাৎ M.D. ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাদের কয়েকজনকে তাঁর চেম্বারে। বক্তব্য খুব ছো অথচ অবাক করে দেওয়ার মতো। সোমেদের কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়। ওদের বলে নয়, ওদের গোটা ইন্ডাস্ট্রিতেই এখন মন্দা চলছে। সবারই আশংকা আরও দু'বছর অন্ততঃ এই অবস্থা চলবে। তাই M.D. সাহেব ঠিক করেছেন যে কোম্পানিতে লোক কমাবেন। ছাঁটাইয়ের একটা তালিকাও তৈরী করে ফেলা হয়েছে ইতিমধ্যে H.R. র সাহায্যে মালিকের অনুমদন সিলমোহল যোগাড় করে ফেলেছেন M.D.। অন্যরা বক্তব্যটা শুনে চুপ করে থাকলেও সোমদত্ত তা পারেনি তার মনে হয়েছিল প্রথমতঃ এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, অথচ তাদের অর্থাৎ কোম্পানির সিনিয়ার ম্যানেজমেন্টর সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন অনুভব করেননি কেউ। এটা কেন হবে ? কোম্পানিটা রোজ চালাচ্ছে তারা, কর্মচারীগুলোকেও পুরো হাল হকিকত তাদের জানা, সোম যেমন, নাম করে করে বলে দিতে পারে গোটা কোম্পানির Accounts & Finance এ যত ছেলে মেয়ে আছে, তারা কে কেমন কাজ করে, কার কতটা যোগ্যতা। অথচ ছাঁটাইয়ের তালিকায় Accounts & Finance র বেশ কিছু কর্মচারীর নাম রাখা হয়েছে এবং তা সোমের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সোম দেখেছে তাতে অবিনাশ বলে ছেলেটির নাম রয়েছে অথচ এই ২৫ - ২৬ বছরের ছেলেটি, সোমের মতে, অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময়। আবার তিওয়ারীর নাম নেই, যেহেতু সে মালিকের কোন ও এক সূত্রে এসেছিল, যদিও সে মোটেই দক্ষ নয় তেমন। তিওয়ারী চাকরি করুক, তারও ক্ষতি চায়না সোমদত্ত, কিন্তু তা বলে অবিনাশের মতো সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে চলে যেতে হবে কেন ? দ্বিতীয়তঃ সোম দেখেছে, কোম্পানিতে যখনই ছাঁটাই শুরু হয়, তখন সেই তালিকার বাইরে যারা আছে, সেইসব কর্মচারীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তারাও তখন অন্য চাকরি খুঁজতে থাকে এবং এটা প্রমাণিত সত্য যে যারা ভালো, যারা সুদক্ষ তারাই অন্য যায়গায় চাকরিটা পায়, চলে যায়, পড়ে থাকে কিছু কর্মদক্ষ কর্মচারীর দল। তারপর ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা যখন ফেরে, তখন ঐ চলে যাওয়া দক্ষ কর্মচারীদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করতে হয় এবং বেশী মাইনে দিয়ে নতুন লোক নিতে হয়। সব মিলিয়ে একটা তৈরী দল ভেঙে যাওয়ায় আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। তাছাড়া আরও একটা কথা মনে হয় তার। তালিকায় যাদের নাম আছে, তারা কতটাকাই বা মাইনে পায় ? সোমদত্তর মতো উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা শুধু একেক খাতে অ্যালাউন্সই পায় ওদের মোট মাইনের চেয়ে বেশী। কাজেই মিছিমিছি কিছু মানুষের ভাত না মেরে সিনিয়ার ম্যানেজারদের অ্যালাউন্স, অন্যান্য সুযোগ

সুবিধা কিছুটা কাট-ছাঁট করলে কোম্পানির খরচও কমে, অথচ ওইটুকু কাট-ছাঁট সোমদত্তদের এমন কিছু বড়মাপের অসুবিধা হয় না। মাঝখান থেকে কিছু সাধারণ মানুষের চাকরি বেঁচে যায়। কাল সোম এই বক্তব্যগুলো জানিয়ে দিয়েছিল M.D. র কাছে। M.D. মানতে চাননি তার কথাগুলো। সোমের ও জেদ চেপে গিয়েছিল যেন। শেষের দিকটায় ব্যাপারটা তর্কাতর্কির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে দেখে রীতি মেনে সোম চুপ করে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মানতে পারেনি ভেতরে ভেতরে। সেই থেকেই মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে তার।

বেলার দিকে তথাগত ফোন করল হঠাৎ। তথাগত তার পিসতুতো ভাই এই ভাইটিকে খুব স্নেহ করে সোম। ছেলেটার নানা গুণ। নানা বিষয়ে আগ্রহ তথার । আজই যেমন, ফোন করেই বলল, ''ছোটদা, সামনের রবিবার বিকেলটায় ফাঁকা আছো?''

— '' হ্যাঁ, তা আছি বোধহয়, কিন্তু কেন রে?''

— ''শোনো, আমি ভাবছিলাম যে আমাদের পরিচিত বৃত্তের মধ্যে যারা লেখালেখি করি, তাদের একটা common platform এ আনা প্রয়োজন যেখানে আমরা নিয়মিত মিলিত হব সবাই, লেখা পরে শোনাবো, আলোচনা, করব, অনেকটা সুনীল গাঙ্গুলির কৃত্তিবাস ধরণের ব্যাপার। তো, তাই ভেবেছি যে আগামী রবিবার থেকে সেটা শুরু করব। এই ধরো, আমি থাকব, তুমি থাকবে, আমার বন্ধু দেবু, চেনো তো, এই যে উকিল , ও থাকবে আরও কয়েকজনকেও বলেছি। যেমন ধরো, পূজার মাসতুতো দিদির এক বান্ধবী আছেন, আমার একটা প্রবন্ধের প্রয়োজনে ওনার বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখলাম ভদ্রমহিলা রীতিমতো লেখালেখি করেন। তোমার বয়সি হবেন, ওনাকে আসতে বলেছি। আসছো তো?''

''হ্যাঁ, আসবো তো বটেই। উদ্যোগটা তো দারুণ নিয়েছিস কিন্তু দেখিস, বেশী ভীড় বাড়িয়ে মানটা নামিয়ে ফেলিস না। দেবু যেমন জানি ভালোই লেখে। কিন্তু ঐ যে তোর সদ্য পরিচিতা মহিলাটি, লেখেন, ঠিক আছে, কিন্তু মানটা দেখতে হবে তথা''।

— ''না গো, ছোটদা, রীতিমত উচ্চমানের লেখা। আমাকে একটা পত্রিকাও দিয়েছেন সেখানে ওনার কবিতা বেরিয়েছে। একটু শোনাচ্ছি, শোন তাহলে বুঝবে,

''যতবার বৃষ্টি ঝরে এই পারে ওই পারে
ঝড়ি আমি গাছের পাতায়, নদীর বুকের মাঝে
মরি আমি সকল নিত্য কাজে,
যতবারই বৃষ্টি ঝরে ভীষণ গোপনে
আকাশ ভেঙে নামাই আমি তোমার খেলাসনে''।

— ''বা! বেশ ভালো,'' স্বীকারোক্তিটা স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে আসে সোমের।

— ''তাহলে ছোটদা, এসো কিন্তু, বলে তথাগত লাইনটা কাটে।''

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সোম বেরিয়ে পড়ে। আজ এক আশ্চর্য্য কাজ করতে চলেছে সে। সে চলেছে সেই হোটেলে সেখানে প্রথমবার সে দেখেছিল দ্বিতীয় নীরাকে। সোমের দৃঢ় ধারণা ঐ ভদ্রমহিলা শিঞ্জিনিই। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে চায় সে। কিছুই নয়, শুধু কৌতূহল। সে দেখতে চায়, অনেকদিন আগে দু এক ঝলক দেখা মেয়েটিই কি সেদিন এসে বসেছিলো তার পাশে! হয়তো এই কৌতূহল অনর্থক, হয়তো এই জানতে চাওয়াটার কোন ও মানে নেই, তবু সোমের মাথায় ক'দিন ধরে খুব তীব্রভাবে ঘুরছে কথাটা। সে ঠিকই করে রেখেছিল আজ যাবে সে সেই হোটেলে। এ কৌতূহল নিবারণের বড় স্পৃহা তার।

রিসেপশনে আজও সেদিনের মেয়েটিই বসে । সোম সোজা গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, ''আচ্ছা, কয়েক মাস আগে আপনাদের এখানে একটা আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন হয় । সেখানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে কিছু মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন''।

– ''হ্যাঁ স্যার, বলুন এবিষয়ে কি করতে পারি আপনার জন্য ?'' মেয়েটি পেশাদারী মিষ্টতায় জানতে চায় ।

– ''আপনাদের কাছে নিশ্চয় কম্পিউটারে একটা লিস্ট থাকবে তাঁদের নামের যারা দেখা করতে এসেছিলেন সেদিন । দেখা যাবে, সেদিন শিঞ্জিনি নামের কেউ এসেছিলেন কিনা ?''

– ''হ্যাঁ স্যার, কেন নয় ? এক মিনিট'' কিছুক্ষণ কম্পিউটারে চোখ বুলিয়ে মুখ তোলে মেয়েটি'' সরি স্যার । ও নামে তো কাউকে পাওয়া যাচ্ছেনা ''।

– ''sure ?''

– ''Absolutly স্যার । ও নামে কেউ নেই''

– ''OK'' হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে সোম । আশ্চর্য্য ! সোমের কিন্তু এখনও দৃঢ় ধারণা ঐ দ্বিতীয় নীরা শিঞ্জিনিই । এতবছর পরেও এত বড় ভুল হবে না সোমের । কিন্তু . . . যাক্ কি আর হবে ? একটা কৌতূহল হয়েছিল, একমাত্র সোম দ্রুত পা চালিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে । তারপর সোজা চালিয়ে দেয় রোয়িং ক্লাবের দিকে । অনেকদিন ক্লাবে যায়নি সে । আজ মাথাটা বড্ড ধরে আছে । একটু ক্লাবে গিয়ে এখন বসবে সে । নিজের সঙ্গে সময় কাটাবে কিছুটা ।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট । নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন । তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি । তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে ।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৪

(৫)

"আসলে জীবনটা সরলরেখা নয় – হলে অবশ্য খুবই ভালো হতো। একমাথায় দাঁড়িয়েই প্রায় পুরো পথটার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যেতো। বাঁকের আড়ালে কোনো অদৃশ্য, লুকোনো surprise থাকতো না। কিন্তু সেটা হয় না!"

শুচি একটু থামলেন। নিজেকে গোছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাগুলোকে আর কলমটাকেও একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

গ্রীষ্মের সকাল, এরমধ্যেই বাইরে রোদ বেড়ে উঠেছে। সিস্টার এসে ব্রেকফাস্টের ট্রে তুলে, জানলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে গেলেন। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে এখন রৌদ্রের আঁচটুকুও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

শুচি ভাবলেন 'জীবনে যদি এমন হতো..... কেউ যদি পথের আঁচটুকু পর্দা নামিয়ে আড়াল করে দিতে পারতো!' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো নিজের অজান্তেই – কে কাকে আড়াল দেবে?

কলমটা তুলে নিলেন আবার। এই জীবনের সবটুকু পর্দা সরিয়ে দেবেন আজ শুচি, সব আঁচটুকু শুষে নেবেন.... তাতে যদি কোনো একদিন ছায়া নামে রীতির উত্তপ্ত জীবনে!

"তুমি যেমন একদিন সকালে উঠে স্কুলে গেলে আর হঠাৎ জানলে যে তোমার জীবনের সোজা রাস্তাটা সত্যি এতো সোজা নয়। বাঁকের মুখে তোমার জন্যে রাখা ছিলো surprise, তুমি জানতে না! কেউ তোমাকে তৈরী করে দ্যায়নি এই surprise-এর জন্যে। তুমি কেঁদে ভাসালে – কাঁদারই যে বয়স সেটা। .... আমি কল্পনায় তোমার সেই আহত ক্রন্দসী মুখটা ভেবে অনেক কষ্ট পেয়েছি, তোমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কে আমার চোখের জলে শুশ্রূষা করতে চেয়েছি দিন রাত। কিন্তু তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারিনি। তোমার বা বাপ্পার স্কুলে যাওয়ার আমার উপায় ছিলো না। ..... একবার বাড়ীতেও আসতে চেয়েছিলাম, তোমার বাবা অনুমতি দ্যাননি। হয়তো ভালোই করেছিলেন। যে 'মরে গেছে', তার স্মৃতি নিয়ে বাঁচা অনেক সোজা – কিন্তু তার ভূতকে ফিরে দেখা সোজা নয়।.... যাই হোক, যা বলছিলাম – জীবন সরলরেখা নয়। আমার জন্যেও ছিলো না রীতি, বিশ্বাস করো!

সেই চাকরি করা নিয়ে শুরু হলো অশান্তি। অনুমতি পেলাম না। অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই করবো, এমন সাহস বা মনের জোর তখনো ছিলো না আমার মধ্যে। আমার মা'কে একবার বলতে গিয়েছিলাম – 'ভাবছি একটা চাকরি করবো..... বাপ্পাকে একটা ভালো স্কুলে দিতে গেলে যা খরচ....'

মা আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ধমক দিয়ে উঠলেন – 'কেন? শীর্ষ কি তোমাকে খাওয়াতে পরাতে পারছে না? কীসের আবার ভালো স্কুল? এই কল্যাণীর স্কুলে পড়ে ওর বাবা যদি ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ভালো চাকরি করতে পারে, তাহলে কলকাতায় পাড়ার স্কুলে পড়ে বাপ্পাও পারবে।..... ঐসব উল্টোপাল্টা রাস্তায় চলে সংসারটা নষ্ট করো না বাপু – শীর্ষর মা সেদিন রাস্তায় আমাকে এই নিয়ে অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন।'

'কী?' আমি চমকে উঠলাম। 'শীর্ষর মা? ... তোমাকে?' মা তাড়াতাড়ি কথাটা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন। আমি আর কিছু বললাম না, কিন্তু মাথাটা কেমন গরম হয়ে রইলো।

অফিসের লোক দরকার – তারা কতদিন আর অপেক্ষা করবে? আরো দু-একবার তোমার বাবাকে বলার চেষ্টা করলাম, লাভ হলো না। শেষে শুনলাম যে ওরা আরেকজনকে নিয়ে নিয়েছে।

সেদিন খুব রাগ হয়েছিলো, জানো? কান্নাও পেয়েছিলো – হতাশার চাপা কান্না, যা গলা ছেড়ে বেরোনোর কোনো রাস্তা খুঁজে পায়নি। রান্না করতে গিয়ে সেদিন নুন কম আর আধপোড়া কি যে করেছিলাম ঠিক নেই। তোমার বাবা একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, আমি গ্রাহ্যও করিনি।

কোনরকমে রান্নাঘরের পাট সেরে একফালি বারান্দাটায় এসে বসেছিলাম। বোবা দৃষ্টিতে বোবা তারাগুলোকে দেখতে দেখতে কখন যেন ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম আমি রবীন্দ্রসদনে গানের প্রোগ্রাম করছি.... খুব মন ঢেলে গাইছি 'পরবাসী, চলে এসো ঘরে' .... মাস্টারমশাই চোখ বন্ধ করে তাল দিয়ে যাচ্ছেন উইংসের পাশ থেকে .... সুশোভন ইয়ার্কি মেরে বলছে 'মেয়েদের আবার ঘর থাকে নাকি ? নিজের পদবীই নেই তার আবার ঘর !' ....

কিন্তু স্বপ্নে তো আর সংসার চলে না, সংসার চলে বাস্তবে। তাই ঘুম ভেঙে উঠে আবার পরের দিন সকাল থেকে শুরু হলো সঙ্গীতবিহীন কর্মব্যস্ত সংসারের চাকা।

সে তো চিরকালই ছিলো, কিন্তু এবারে যেন সবকিছুই খুব তেতো হয়ে গিয়েছিলো। আবেগহীন, হাসিহীন, কান্নাহীন, তিক্ত একটা জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া যে কী কঠিন সে হয়তো তুমি বা তোমরা জানো না।

ঐ যে বললাম, আমি তোমাদের যুগে জন্মালে হয়তো এতোকিছু বলারই দরকার হোতো না!

তুমি যেমন পাঁচমিনিটে রবির অনধিকার চর্চা বন্ধ করে দিয়েছিলে, আমি যদি তার আর্দ্ধেকও করে পাঁচবছরে শুধু একটা অধিকারের গণ্ডী কেটে দিতে পারতাম নিজের চারপাশে ...... তাহলে হয়তো আজ এই চিঠি লেখার প্রয়োজন হতো না।

কিম্বা তাও হয়তো হতো! সঠিক জানিনা। জোর দিয়ে বলতে পারি না।

কারণ এটাও সত্যি যে বিয়ের কয়েকবছরের মধ্যেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়েটা একটা compromise – আর সারাজীবন সেই compromise এর বোঝা টেনে চলতে আমি রাজী ছিলাম না। আমার ভেতরের সঙ্গীতকে, আনন্দকে, হাসিকে সংসারের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে আমি রাজী ছিলাম না। একেবারেই না। জীবনের একটা বড়ো 'ভুল' কে 'ঠিক' করার এক অদম্য ইচ্ছে আর সাহস আমার ভেতরে দিনে দিনে বেড়ে উঠছিলো, অধিকারহীন জীবনের হীনমন্যতা হয়তো সেই বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ইন্ধনের কাজটুকুই করেছিলো, আর কিছু নয় ? ! ....

তবে আমার রাজী-অরাজী ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে যে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না, জীবন আমাকে তাও দেখিয়েছে – হাসবো বললেই হাসা যায় না, এও শিখেছি ..... তবে সে অনেক অনেক পরে!

জানো রীতি, যারা 'শুনে শেখে' তাদের জন্যে জীবনের পাঠ অপেক্ষাকৃত সোজা – আমার মতো যারা 'ঠেকে শেখে', তাদের জন্যে কিন্তু তা' নয়। জীবন তাদের নাকে ঘষা দিয়ে রক্তাক্ত করে ছাড়ে !

সে যাক, দুঃখ এটাই যে সেই ঘর্ষণে আরো অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে গেলো ..... যাদের রক্তাক্ত হওয়ার কথা ছিলো না তারাও ক্ষতবিক্ষত হলো ! অকারণে।

যা বলছিলাম – কুড়ির শেষভাগে দাঁড়ানো আমার কাছে তখন জীবনদর্শনের এতো পাঠ জানা ছিলো না। কারই বা থাকে? তখন আবেগ ছিলো প্রবল, আমার মতো শিল্পী বা শিল্পপ্রেমীদের তো আবেগ আরও বেশী হয়, জানোই! তোমার

ইঞ্জিনীয়ার বাবার মধ্যে অবশ্য আবেগ জিনিসটা ছিলো না, আর আমার আবেগকে সস্নেহে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো উদারতাও ছিলো না – ফলে, যা হওয়ার তাই হলো ।.....

তোমরা যে আজকাল গ্র্যাজুয়েট হয়েই বিয়ে করে ফেলো না, এটা যে কতো ভালো সেটা আমি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করি । ঐ বয়সে না থাকে maturity, না হয় জীবনের অভিজ্ঞতা! বিয়ে জিনিসটা এতো সোজা নয় । চাঁদ-ফুল-মালা আর ক'দিনের ? সারাজীবনের commitment টেনে চলার মতো compatibility আছে কিনা দু'জনের, এটা বোঝার আগেই সমাজ এবং মা-বাবা-পরিজন মিলে 'বিয়ে' জিনিসটাকে মাথার ওপর চাপিয়ে দিতো আমাদের সময়ে । লাগলে তুক আর না লাগলে তাক! আর সেই 'তাক'-এর বোঝা টেনে চলতে চলতে কত couple ভুলেই গেছে যে বিয়ের, বা যে কোনো conjugal life-এর, আসল মানেটা কী!

আজকাল ডাক্তাররা বলেন যে মানুষের taste-bud নাকি সাতবছর অন্তর পাল্টায়, প্রথমজীবনে বেশী পাল্টায় । ছোটবেলায় যা খেতে ভালোবাসতে তুমি, তিরিশে পা দিয়ে সেটা হয়তো আর ছুঁয়েও দেখতে ইচ্ছে করবে না তোমার ! আবার উল্টোটাও সত্যি । যে খাবার খেতেই না, সেটা হয়তো বেশী বয়সে হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেলো! আমার তো মনে হয় শুধু জিভের পছন্দ নয়, মনের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি । তাই জিভকে stabilized হতে দেওয়ার মতো মনকেও stabilized হতে দেওয়া উচিত, জীবনসঙ্গী নির্বাচনের আগে । তা নাহলে অশান্তির সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায় পরবর্তী জীবনে ।

অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়ে বিয়ে করাও খুব দরকারী, জানো? তাতে সবাই প্রথম থেকেই একটা পারস্পরিক সম্মান এবং বোঝাপড়ার জায়গা থেকে শুরু করে সম্পর্কটা । আমাদের সময়ে খুব কম মেয়েই এটা করতে পেরেছে, বা বলা ভালো যে আমাদের সময়ে খুব কম মেয়েকেই এটা করার অনুমতি দেওয়া হতো । নিজের মা-বাবাই বিয়ে দিয়ে ঘরছাড়া করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন ! ....

আমার কি মনে হয় জানো? আগে যে বাল্যবিবাহ দেওয়া হোতো, সেটাও বোধহয় এর চেয়ে ভালো ছিলো । অন্তত মেয়েটি ছোটো থেকেই শ্বশুরবাড়ীর পরিবেশের সঙ্গে accustomed থাকতো । আমাদের তো তা নয়! আমরা বড়ো হলাম একভাবে – পড়াশোনাও শিখলাম, বোধবুদ্ধি-রুচি-ব্যক্তিত্ব সব তৈরী হলো জন্মগত পরিবেশে । তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের বলা হোলো অন্যবাড়ীর সব নিয়ম বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে । সেটা কি হয় ? একটা দশ বছরের মেয়ের জন্য সেটা সোজা হলেও, একটা কুড়ি বছরের মেয়ের জন্য সেটা মোটেই সোজা নয় । বা হয়তো কারুর কারুর জন্য সোজা, কিন্তু আমার মতো যারা তাদের জন্য সোজা নয় – কোনদিন সোজা ছিলো না । সেইটা বুঝতে বুঝতে বোধহয় একটা কি দুটো জেনারেশন পার হয়ে গেলো ।.... কি আর বলবো, বোলো ? সমাজ জিনিসটা মেয়েদের ওপর কেনই বা চিরকাল খর্বহস্ত, আবার সেই নারী শক্তিকেই মা-দুর্গা বা মা-কালী রূপে কেনই বা পুজো করে – এই ধাঁধার জবাব আমি আজো পাইনি ।....

বম্বে এসে অবশ্য আমি স্বাধীনভাবে চাকরি করেছি – কোথাও বাধা পাইনি । খুব ভালো কয়েকজন বন্ধুকে পেয়েছিলাম বম্বেতে চাকরি করার সময়ে, যারা আজও আমার পরম বন্ধু । তাদের মধ্যেই একজন, মালা দেশাই, আমাকে পরে অনেক সাহায্য করেছিলো – যখন আমি কানাডা থেকে ফিরে আসতে চাইছিলাম, একটা চাকরি খুঁজছিলাম । কানাডা থেকে ওর কাছেই প্রথম এসে উঠেছিলাম ওদের আন্ধেরির বাড়িতে, ওর হাসব্যাণ্ডের বন্ধুর অফিসে একটা কাজ নিয়ে । .... সে অবশ্য অনেক পরের কথা ।

প্রথম যখন বম্বে এলাম, জীবনের সেই প্রথম চাকরি আমাকে একটা অন্য জগতে পৌঁছে দিয়েছিলো । অনেক হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলো । তোমার ঠাকুমা এবং বাবাকে খুশী না করেও, কারোর পোষ-মানা ময়না হয়ে দাঁড়ে বাঁধা না থেকেও, যে দানা-পানি পাওয়া যায় সেই বোধটা আমাকে এতো আনন্দ দিয়েছিলো যে একমাসের মধ্যেই আমি হতাশা আর ডিপ্রেশন ঝেড়ে ফেলে হাসতে পারলাম, আবার গান করতে পারলাম ।

হ্যাঁ, ডিপ্রেশন হয়েছিলো আমার তোমাদের ছেড়ে বম্বে আসার পর – কঠিন ডিপ্রেশন। যার সাথে লড়াই করেছি প্রতিদিন, কিন্তু হার মানিনি। এই ডিপ্রেশন একদিনের নয় – অনেকদিনের চাপা থাকা অনেক আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

সুশোভন বলেছিলো ফিরে যেতে, আমি রাজী হইনি – বদলে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম থেরাপির জন্যে এবং চাকরি শুরু করেছিলাম। তাতে ফলও পেয়েছিলাম। ফিরতে তখন আমি মোটেই চাইনি, কারণ যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে ঘর ছেড়েছি সে স্বাধীনতা তখনও হাতে আসেনি – ফিরে গেলে যে আবার দু'গুণ ডিপ্রেশনে ভুগবো, সেটা সুশোভন পুরো না বুঝলেও আমি জানতাম।

সে যাক, কাজ শুরু করলাম একটা ব্যাঙ্কে যেই ব্যাঙ্ক সুশোভনের বিজনেস finance করে।

প্রথম মাসের মাইনের টাকা পেয়ে আমি একটা ছেলেমানুষী করেছিলাম – জানো! অফিস থেকে সোজা দোকানে গিয়ে বাপ্পার জন্যে ওর পছন্দের সেই স্নিকার জোড়া কিনলাম আর তোমার জন্যে একটু বড়ো সাইজের খুব সুন্দর ডিজাইনের একটা ফ্রক। Sender's name না দিয়ে, overnight courier-এ, সেই দুটো জিনিস তোমাদের টালিগঞ্জের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর বুক ধুকপুক – পৌঁছলো তো ? তোমরা পরলে তো ? ....

বাপ্পার সঙ্গে ক'দিন আগেই খুব হাসাহাসি হলো এটা নিয়ে – ও বললো যে কেউ বুঝতেই পারছিলো না যে gift-গুলো এলো কোথা থেকে ! শেষে সবাই নাকি ভেবে নিয়েছিলো যে তোমার বাবার সেই বড়োলোক পিসতুতো দিদি, যিনি তোমার অন্নপ্রাশনে আসতে পারেননি, তিনিই বোধহয় পাঠিয়েছেন। কেউ ভাবলোই না যে তিনি বাপ্পার পায়ের মাপ পাবেন কোথায় ! আর ভাবলো না বলেই সেই জিনিসগুলো তোমরা পরলে, ব্যবহার করলে – আজ এতো বছর পরে এটা জেনে যে আমার কি আনন্দ হলো ! ....

দেখো, কোন কথা থেকে কোথায় চলে এলাম! বলছিলাম আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাধীনতার কথা। ... পরবর্তী জীবনে, বিদেশে এসে, দেখেছি নারীস্বাধীনতা কথাটার পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা – স্বামী বাড়ী এসে রান্না করছে এবং স্ত্রী খাচ্ছে কোনো guilt feeling ছাড়া ..... আমাদের দেশের মেয়েরা কি কোনোদিন ঐরকম স্বাধীনতা পাবে ?

আমাদের প্রতিবেশী ছিলো লিজ, খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো ওদের সাথে। দেখতাম রান্না করতে ইচ্ছে করছেনা, pizza order করে দেওয়া হচ্ছে। স্বামী বন্ধুদের সঙ্গে golf খেলতে যাচ্ছে, স্ত্রী বাচ্চা সামলাচ্ছে; আবার পরের সপ্তাহে স্ত্রী তার বন্ধুদের সঙ্গে weekend travel এ যাচ্ছে, স্বামী বাচ্চা সামলাচ্ছে। একদম সমান সমান, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক।

অথচ ওদেশে থেকেও অনেক ভারতীয় পরিবার এই কালচারটা adopt করতে পারেনি। আবার অনেকে করেওছে। যারা করেছে, তাদের পরিবারের পুরুষরা সাধারণ ভারতীয় মাপকাঠির বাইরে – তারা একটু 'অসাধারণ'। তোমার খারাপ লাগবে জেনেও বলছি – তোমার বাবার মধ্যে এই অসাধারণত্ব ছিলো না, কিন্তু সুশোভনের মধ্যে ছিলো। আগেই বলেছি যে ও ছিলো একটু বোহেমিয়ান টাইপের, সমাজের কোনো নিয়মকাননেরই ধার ধারতো না। ...... জীবনে অল্প কিছুদিনের জন্যে হলেও এই অসাধারণত্বের স্বাদ ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন। খুব মন দিয়ে চাইলে বোধহয় সবকিছুই পাওয়া যায় জীবনে, আমিও পেয়েছিলাম। কিন্তু সব পাওয়ার জন্যেই একটা দাম দিতে হয় – সেই দাম আজও মিটিয়ে চলেছি কড়ায়গণ্ডায়।

যাই হোক, কানাডাতে থাকা সেই কয়েকটা বছর আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে অনেক কিছু জমা করেছে। বেড়াতে আমি বরাবরই ভালোবাসতাম, কিন্তু তোমার বাবার বছরে যে ক'দিন ছুটি থাকতো সে ক'দিন অবধারিত ভাবেই আমাদের কাটতো কল্যাণীতে।

প্রথম যখন বাড়ীর বাইরে একা বেরোলাম, বম্বের সমুদ্র যেন দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কোলে টেনে নিলো। কী যে ভালো লাগলো মেরিন ড্রাইভ, জুহু! বছর পাঁচেক কাটিয়েছিলাম আরবসাগরের তীরে। তারপর আটলান্টিক পার হয়ে চলে গেলাম কানাডা।

তোমার বাবা তখন আমার সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন, আমাকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে বাড়ী ছেড়েছিলাম, পাঁচবছরে বম্বেতে সেই স্বাধীনতা হাতে পেয়ে আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিলো ..... হীনমন্যতা চলে গিয়েছিলো ..... মনের তিক্ততা কিছুটা হলেও চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

এও মনে হয়েছিলো যে তোমার আর বাপ্পার মুখ চেয়ে হয়তো বা তোমার বাবার সঙ্গে কিছুটা compromise করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো – যদিও চাকরি ছাড়বো না এটা নিশ্চিত। মনে এ' আশাও ছিলো যে তোমার বাবা হয়তো এতদিনে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন, হয়তো বুঝতে শিখেছেন যে সংসার করতে গেলে দু'তরফেই সমঝোতা লাগে। দরকার হলে কলকাতা ছেড়ে আমরা বম্বেতে থাকবো।

কিন্তু সেসব কিছুই হলো না। তোমার বাবার আর আমার গ্রহ বহুদিন থেকেই আলাদা কক্ষপথে ঘুরছে, তাই পথ আর মিললো না। মাঝখান থেকে আমার বন্ধু দীপা হলো অপমানিত। সে-ই আমার দেখা করার প্রস্তাব নিয়ে ফোন করেছিলো তোমার বাবাকে – তোমার বাবা জানিয়েছিলেন যে আমার মতো 'চরিত্রহীন' মহিলা ব্যানার্জীবাড়ির এক 'কলঙ্কিত ইতিহাস', যাকে সবাই ভুলতে চায়। আর কল্যাণীর রাস্তায় একদিন দীপাকে একা পেয়ে তোমার ঠাকুমা যা মুখে আসে তাই শুনিয়ে দিলেন – 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' থেকে 'বেশ্যার দালাল' .... কিছুই বাদ গেলো না। তোমার ঠাকুমা এও বললেন যে 'ব্যানার্জীবাড়ীর বাইরে একবার পা দিলে আর ভেতরে ঢোকা যায় না' এ'কথা তিনি প্রথম দিনেই তাঁর ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছেন – তাঁর ছেলে সে কথা অগ্রাহ্য করবে এমন ভাবার সাহস হলো কি করে দীপার !

অতএব, কানাডা। .....

ভাগ্যিস এসেছিলাম কানাডা, নাহলে হয়তো আমাকে আবার ডাক্তারের কাছে ছুটতে হতো ডিপ্রেশনের পুরোনো প্রেসকিপশন রিনিউ করাতে। শুধু তাই নয়, সেই কানাডাযাত্রা আমার মনের চোখ খুলে দিয়েছিলো। সেই যে আমার চঞ্চল মন, যে সুদূরের পিয়াসী হয়ে সারাক্ষণ চাতকপাখির মতো টালিগঞ্জের বাড়ীর জানলা দিয়ে একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, সেই মন শান্ত হলো তৃপ্ত হলো কানাডা এসে।

তাই মনে হয় যে জীবনে 'Destiny' কথাটার বোধহয় সত্যি একটা গভীর অর্থ আছে। পরম শক্তিময় একজন সুতো ধরে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন সেই জায়গায়, যেখানে আমাদের পৌঁছতে হবেই ..... to reconcile with our own souls, to fulfill our hidden goals, to satisfy our thirst ..... নাহলে মুক্তি নেই। মুক্তির পথ বড়ো কঠিন – মনের গোচরে অগোচরে যা চাওয়া যায় ...... ঠিক বা ভুল ..... সবের হিসেব নিকেশ পাওনা দেনা শেষ হলে তবেই বোধহয় আসে সেই পরম মুক্তি।

যা বলছিলাম, কানাডা এসে মন শান্ত হলো।

জায়গাটার পরিবেশেই যেন ছিলো অপরিসীম শান্তির ছোঁওয়া।

কল্যাণী আর টালিগঞ্জের গা-ঘেঁষাঘেঁষি পাড়ায় জীবন কাটানো আমি, কানাডার বাড়ীর সবুজ লনে বসে বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিলাম।

Pollution-free আকাশের ঘন নীলে মোহগ্রস্ত হয়ে গেলাম।

রাস্তায় একটা কুকুর-বেড়াল নেই, গরু নেই, মানুষজনও কম।

সবাই যেন সবার জন্যে অনেকটা space ছেড়ে রেখেছে – কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই।

প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে দেখে হেসে ‘হাই-হ্যালো’ বলছে, কিন্তু কার বাড়ীর বন্ধ দরজার পেছনে কি হচ্ছে তা জানতে কারুর কোনো কৌতুহল নেই।

ছেলে-মেয়েরা আঠারো বছর বয়স থেকেই স্বাধীন, দরকার হলে তার আগে থেকেই ছোটখাট কাজ করে তারা হাতে টাকা জমায় এবং নিজের খরচ চালায়।

ছোটখাট কাজ বলতে যে কোনো কাজ – বিরাট বড়োলোক মিলিয়নিয়ার বাবার ছেলে গিয়ে রেস্টুরেন্টে বাসন ধুলে, অবাক হবার কিছু নেই।

‘Dignity of labor’ কথাটার মানে এখানে সবাই ছোটবেলা থেকেই শিখে যায়। সব কাজ সমান – কোনো ছোট-বড়ো নেই।

‘কাজকে সম্মান করতে শেখো’ ..... ‘নিজের পায়ে দাঁড়াও’ – এই হচ্ছে শিক্ষার গোড়ার কথা।

কাকে বিয়ে করবে, সেও ছেলেমেয়েদের নিজেদের ইচ্ছে এবং বিয়ের পরে তাদের সংসারের কোনো বিষয়ে নাক গলানোর কথা কোনো তরফের মা-বাবাই ভাবতে পারেন না। স্বামী বা স্ত্রী সেটা হতেও দ্যায় না।

পরস্পরের হাতে হাত ঢুকিয়ে, গলা জড়িয়ে ধরে নিজেদের মা-বাবার সামনে যাওয়ার মধ্যে এদের যেন একটা মেসেজ লুকোনো থাকে – “আমরা দু’জনে এখন একটা টীম – এই টীম ভাঙার চেষ্টা কোরোনা, তবেই সম্পর্ক ভালো থাকবে।”

আমার কেন জানি মনে হোতো যে এইরকম একটা মেসেজ ভারতীয় মা-বাবাদের বিয়ের প্রথম রাতেই দিয়ে দেওয়া উচিত, তা সে যে ভাবেই হোক না কেন। তাহলে বিনাতর্কে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পারস্পরিক সম্পর্কের এবং অধিকারের গণ্ডীটা তাহলে প্রথম থেকেই বিভাজিত থাকতে পারে।

সত্যি যদি এইরকম ব্যবহার কোনদিন ভারতীয় সমাজের সর্বতলায় আরোপিত হয়, ভারতীয় ছেলেরা যদি মেরুদণ্ড সোজা করে স্ত্রীকে নিজের ‘টীম’ বলে ঘোষিত করে, সেদিন দেখবে শাশুড়ী-বৌয়ের সম্পর্কের তিক্ততা চলে যাবে। শাশুড়ী বৌকে সম্মান দেবেন, বিনিময়ে সম্মান পাবেন। ..... জোর করে কিছুই হয়না। সম্মানও না, ভালোবাসাও না।

ওদেশে দেখেছিলাম যে স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে অনাবশ্যক বাঁধনে বাঁধে না, সম্পর্কের ফাঁস গলায় পরিয়ে দ্যায় না। সেটা যে কী ভীষণ মুক্তি! .....

ব্যক্তিস্বাধীনতার এতো বড়ো সম্মান আমি আগে কখনো দেখিনি।”

আবার দরজায় টোকা। দুপুরের খাবার। খিদে একেবারেই নেই, তবু খেতে হবে। শুচি দইয়ের বাটিটা সরিয়ে নিতে বললেন। সিস্টার হেসে বললেন – “না খেলে গায়ে জোর পাবেন কি করে ? চিকিৎসার ধকলটা নিতে হবে তো !” শুচি শুধু একটু হাসলেন, তর্ক করতে ইচ্ছে হলো না। অনেক ধকল নিয়েছেন জীবনে, শারীরিক এবং মানসিক। এবার ঘুমোনোর পালা। ‘সমুখে শান্তিপারাবার .....’!

খাবার শেষ করে চশমাটা খুলে রাখলেন। আজকাল একটুতেই খুব ক্লান্ত লাগে। চোখদুটো জ্বালা করছে। একটুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে হবে না। সিস্টার ওষুধ দিয়ে, খাবারের ট্রে হাতে বেরিয়ে গেলেন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। আবছা অন্ধকার এসে ঠাণ্ডা হাত রাখলো শুচির দু’চোখে।

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সেই বিকেল। চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ বলে দিলো যে সাড়ে চারটে বেজেছে।

পর্দা সরানো ঘরে বিকেলের পড়ন্ত আলো। এতক্ষণ ঘুমিয়েছেন ভেবে অবাক লাগলো শুচির – ঘুম তো আজকাল প্রায় আসেই না ঘুমের ওষুধ ছাড়া !

আসলে দুদিন ধরে মনটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে আসছে। রীতিকে চিঠিটা লিখতে লিখতে মনের ভেতরে যেন মল্লার রাগ বেজে উঠছে।

মাস্টারমশাই বলেছিলেন "মল্লার বা মলহার কথাটা এসেছে 'মল হর' থেকে – এই রাগ মালিন্য হরণ করে।" শুচিরও যেন মনে হচ্ছে জীবনের সব মালিন্য ধুয়ে মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।....

ধীরে ধীরে উঠে বাথরুমে গেলেন শুচি।

ভিজিটিং আওয়ার্সের সময় হয়ে এলো। বাপ্পা আসবে বোধহয়।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরোনো দিনের কথা

পর্ব ২

পুরোনো কলকাতার গল্প – আমার জীবণ স্মৃতি, আট দশক পূর্বের কাহিনি

এটি আমার ছোটবেলার, ১৯৪০-৪৪ সালের ঘটনাবলীর দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি পাঠকরা অভূতপূর্ব সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন, ও তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধেই আমি এইটি লিখতে সাহস করি। জীবনের সায়াহ্নে এই সব হারানো দিনের অমূল্য স্মৃতি রোমন্থন করে যে আনন্দ পাই তারই কিয়দংশ আপনাদের উপহার দিতে পেরে আমার অসীম তৃপ্তি। পরিণত বয়স – আমার ৮৫তম বছর চলছে – ও সর্বপরি ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়-যন্ত্রের দৌলতে পৃথিবীতে সময় আমার অনিশ্চিত, সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সময়ের কলকাতার কিছু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আশা করি আপনারা পড়ে উপভোগ করবেন।

আমাদের ছোটবেলায় প্রধান আকর্ষণ ছিল সার্কাস, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম ও কচ্চিৎ কদাচিত বায়োস্কোপ। বড়দিনের সময় বিলেত থেকে মস্ত সার্কাস দল আসতো, তাদের তাঁবু পড়তো গড়ের মাঠে। বিচিত্র সব জন্তু-জানোয়ারের খেলা, মৃত্যুকূপে মোটরসাইকেলের কেরামতি আর সোনালী চুলের মেমসাহেবদের সুউচ্চ দোলনায় ট্র্যাপীজের ডানপিটে খেলা আমরা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করতাম। পাইকপাড়ায় আর একটি বড় মাদ্রাজি সার্কাস আসতো। আর চিড়িয়াখানা তো ঘরের জিনিস, বছরে ছুটির দিনে, বিশেষ করে সরস্বতী পূজার দিন ভোগ খেয়ে দুপুরবেলায়, বার তিনেক যাওয়া হতই। বাঘ, সিংহ ছাড়া আমাদের মহা আনন্দ হত হাতীর পিঠে চড়া ! আর আমরা ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করতাম সেই হিপোপটেমাসটিকে, যেটি কিছুদিন আগেই একটি ছোট্ট ভিখারীর মেয়েকে গিলে ফেলেছিল। মেয়েটি, নাম যতদূর মনে পড়ছে ফুলরেণু বা ফুলেশ্বরী, অসাবধানে পা ফসকে বেষ্টনীর নিচে, একেবারে হিপোটির হাঁ এর মধ্যে! কি মর্মান্তিক !

আমাদের অভিভাবকরা আমাদের দেখাতে ছাড়তেন না একটি কচ্ছপকে। এই কচ্ছপটির বয়স তখনই দেড়শো বছর পেরিয়ে গেছে এবং এর মাহাত্ম্য হল যে স্বামী বিবেকানন্দ চিড়িয়াখানা দেখতে এসে না কি এর গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন। এর চাক্ষুস সাক্ষী স্বামীজির শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, তাঁর একটি বইয়ে ঘটনাটি তিনি লিখেছেন। এর মর্ম অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নি, এখন হলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতাম ।

মেট্রো সিনেমা হলে জনি ওয়েসমূলার অভিনীত টারজান দি এপ ম্যান, টারজান ফাইন্ডস এ সন ইত্যাদি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা এক অবর্ণনীয় ব্যাপার ! রোমহর্ষক টান টান উত্তেজনা কি ! আর কিংকং ? আর কে ও রেডিও পিকচার্স প্রযোজিত ছবিতে দৈত্যাকার পর্বতপ্রমাণ গোরিলার তান্ডব দেখা কি কম উত্তেজক ? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মানুষে গড়া দৈত্যের বিভীষিকা দেখে ভয়ে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছিলাম, এখনও মনে আছে। তবে নিউ এম্পায়ারে লরেল-হার্ডি বা চার্লি চ্যাপলিনের মজার কান্ড-কারখানা দেখে হেসে লুটোপুটি খাওয়ার আনন্দটাও মনে গেঁথে আছে। ছবি সব সাদা-কালো, এখনকার মতো বিশাল পর্দায়ও নয়, কিন্তু তাতে আমাদের আনন্দ-উদ্দীপনায় তো কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি।

মা-মাসীরা দল বেঁধে দাদামশায়ের বজরার মত মস্ত অষ্টিন গাড়ীতে গেলেন উত্তর কলকাতায় তখনকার নামকরা চিত্রা (পরে নামকরণ হয় মিত্রা, এখন বিলুপ্ত) সিনেমা হলে সদ্যমুক্ত ছবি প্রমথেশ বড়ুয়া-কানন দেবী অভিনীত "মুক্তি" দেখতে।

এই ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল শুধু অভিনয়ের জন্য নয়, পঙ্কজ মল্লিক এর গানের জন্যও বটে । বিশেষ করে "দিনের শেষে, ঘুমের দেশে" ও কানন দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত "আজ সবার রং এ রং মেশাতে হবে" লোকের মন হরণ করে নিয়েছিল, মুখে মুখে ফিরতো এই গান । তখন সায়গল-পঙ্কজ মল্লিক-শচীন দেব বর্মণ-অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে (মান্না দের কাকা ও গুরু) গানে ভাসিয়ে তুলেছেন সারা দেশকে ! সায়গলের রবীন্দ্রসঙ্গীত "আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলেম গান" ও হিন্দী "সো জা রাজকুমারী", শচীন দেব বর্মনের "তাজমহল" ও অন্যান্য রাগপ্রধান গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে", "ফিরে চল আপন ঘরে" (নাট্যসম্রাট শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটকের গান) আর পঙ্কজের অননুকরণীয় কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও হিন্দী গান মাতিয়ে তুলেছিল জনসাধারণকে । পঙ্কজের রবিবারে বেতারে সঙ্গীত শিক্ষার আসর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য জনপ্রিয় গান । "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" এর লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছ থেকে শোনা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানটি শুনতে ভালবাসতেন। মহালয়ার ভোরবেলার অনুষ্ঠানটি তো সর্বজনবিদিত । আর পঙ্কজের "পিয়া মিলন কো যানা" আসমুদ্রহিমাচল মাতিয়ে রেখেছিল । এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী বাদে উনি যখন কলকাতায় দেহত্যাগ করলেন সুদূর অমৃতসরের সংবাদপত্রে হেডলাইন বেরোল, পিয়া মিলন কো যানা চলে গয়েঁ ! এতই ছিল তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এই স্বর্ণকণ্ঠী গায়কের ওপর ! এই আপাদমস্তক নির্ভেজাল বাঙ্গালী বহু অর্থ ও যশের মায়া ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় কলকাতাতেই আমৃত্যু রয়ে গেলেন, বম্বের প্রলোভন উপেক্ষা করে ।

তখন চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যাবেলা ধর্মতলা থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত হাঁটার অনুভূতির তুলনা হত না, মনে হত এক অচেনা বিদেশে এসেছি । চওড়া, নিষ্কলুষ ফুটপাত, বড় বড় কাঁচের জানলা সমৃদ্ধ চোখ-ধাঁধাঁনো আলোকিত ঝলমলে সব দোকান, মেট্রো সিনেমায় স্যুট পরা সাহেবরা ইভনিং গাউন পরা মেমসাহেবদের নিয়ে গ্রেটা গার্বো, ভিভিয়ান লে, হামফ্রে বোগার্ট, ক্লার্ক গেবেল অভিনীত ছবি দেখতে ঢুকছেন, উগ্র সিগারেট ও সেন্টের গন্ধে বাতাস ভরপূর, তারপরেই হোয়াইটয়ে লেডল আর আর্মি-নেভী স্টোর্স – বিখ্যাত বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্টাল দোকান দুটি সর্বাধুনিক বিলিতি জিনিসপত্রে পূর্ণ সম্ভারে ! একটু এগোলেই রাজসিক গ্র্যান্ড হোটেল, তার জাঁকজমকপূর্ণ ধড়াচূড়া পরা রক্ষীকে দেখলেই আর সেই মায়াপুরীর ভেতরে উঁকি মারার সাহস হত না । তবে ফার্পো – অনেকে উচ্চারণ করতো ফিরপো – মনে হত আরো সহজগম্য যদিও অনেক দিশি ও বিদেশি সাহেব-মেমরা ডিনার খেতে ঢুকছেন। বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট ও নিউ ক্যাথেতে দেশি লোকের ভিড়, সেখানেই আমাদের স্বস্তি! জানবাজার ও চৌরঙ্গীর মোড়ে (তখন ঐ নামেই পরিচিত ছিল এস এন ব্যানার্জি রোড ও জওহরলাল নেহেরু রোড) লোভনীয় অনাদি কেবিনের মোগলাই পরোটা, সঙ্গে এক প্লেট মাংস আবশ্যিক ছিল। কিছুদূর এগিয়ে যাদুঘর, ভেতরে পুরাকালের সব অদ্ভুত দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে মমি দেখতে দেখতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো । বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে ঢুকে শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নিউ মার্কেট, কি তার জাঁকজমক পূর্ণ বিপনি সম্ভার, প্রবাদই ছিল এখানে চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায় ! আর দোকানদারদের সাহেব-মেম ক্রেতাকে সেই বিখ্যাত সনির্বন্ধ আবাহন – টেক (take) তো টেক, না টেক তো না টেক, একবার তো সি (see)! হরেক রকম সৌখিন বস্ত্রাদি ছাড়া বিশ্বখ্যাত বিলাতি ডওয়ালটন ক্রকারি, শেফিল্ডের কাটলারি, নাহুম, ডি গামার কেক পেস্ট্রি, মধ্য প্রাচ্য, আফগানিস্থান থেকে আমদানি মেওয়া, খেজুর, রকমারি শুকনো ফল, আর পেছনে মাছ-মাংসের, ফল-ফুল-সব্জির বিশাল পশরা । বিফ, পর্ক, পাঁঠার মাংস আর যে কত রকমের পাখীর মাংস পাওয়া যেত তার ইয়ত্তা নেই । বাঙালিদের একটি মাংসের ওপর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেটা হচ্ছে গ্রাম-ফেড মাটন, ভেড়ার মাংস, তাও যে সে ভেড়া নয়, ঘাস না খাইয়ে রীতিমত ছোলা ও অন্যান্য দানা খাইয়ে ! এই মাংস তুলতুলে নরম ও অপূর্ব স্বাদের ছিল, এর দামও ছিল সাধারণ মাংসের দ্বিগুণ ! চৌরঙ্গী পাড়াকে বলা হতো সাহেব-পাড়া, সবই ফিটফাট, ছিমছাম, সাহেবরা নোংরা দেখতে পারে না, অন্ততঃ বাইরে! সাদা জামা, হাফ প্যান্ট আর লাল পাগড়ি পরা পুলিশেরা (তখন তাদের এই পোষাকই ছিল) সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারিদিকে, সাইডকার ওয়ালা মোটরসাইকেলে লালমুখো

সার্জেন্টরা টহল দিয়ে যাচ্ছে, বৃটিশ যুগ বলে কথা ! এখন এই কুৎসিত, নয়নপীড়িত, হকারকলঙ্কিত ফুটপাত দিয়ে হাঁটলে বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে এই চিন্তা করে যে আমাদের কতদূর অবনতি হয়েছে ! হায় আমাদের দুর্ভাগা কলকাতা !

আজ এখানেই শেষ করছি । এরপর তখনকার সাধারণ জীবনযাপন নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা রইলো ।

(চলবে)

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) পিতার কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরেই স্কুল ও প্রাক-ইউনিভারসিটি কলেজে শিক্ষা । তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮) । তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে । কোর্স সমাপনে কলকাতার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের তাদের তদানীন্তন লন্ডনের হেডঅফিস দ্বারা নিযুক্ত । আরো ৬ মাসের লন্ডনে বিশেষ ট্রেনিং এর পর দেশে প্রত্যাবর্তন ও সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭) । অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত ।

তন্ময় চক্রবর্তী

কবিতার সাজপোশাক

লিমেরিক

আয়ারল্যান্ডের এক ছোট্ট শহর লিমেরিক। যুদ্ধ শেষ। ফরাসী সৈন্যদলের আইরিশ ব্রিগেডিয়াররা চাঁদের আলো মাখা রাত্রিতে গান গাইতে গাইতে শহরে ফিরছে। দূর থেকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত শোনা যাচ্ছে শেষ লাইন.... Let us come up to Limerick. সৈনিকেরা কোরাসে গাইছে। ছোট গান। কবিতার মতন। ভাষা গবেষকরা বলেন, হয়তো কোনো অজানা কবির হাত ধরেই সৃষ্টি হয়েছিল এই ছোট কবিতা। কবিতার ক্লাসে অনেকেই আদর করে একে Little poems বলে ডাকেন। যুদ্ধের ক্লান্তি ও ভয়াবহতা ভোলার জন্যই সম্ভবত সেই সৈনিকেরা এই ছোটকবিতা গুলিকে গানের মত করে গাইতেন। যুদ্ধোত্তরকালে তাঁরা তাদের বন্ধু এবং পরিবারকে এই গান শোনাতেন।

লিমেরিক আসলে একধরণের ছোট কবিতা। অনেকে একে বলেন ছোটো ছড়ার গান।এই কবিতার বৈশিষ্ট অনেকটা এইরকমঃ

চরণ বা পঙতি সংখ্যা ৫ (পাঁচ)।

অন্ত্যমিলের বিন্যাস হলো.... ক ক খ খ ক।

প্রথম দ্বিতীয় এবং পঞ্চম লাইনে অন্ত্যমিল।

তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনের মধ্যে অন্ত্যমিল

তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন, প্রথম দ্বিতীয় এবং পঞ্চম লাইন থেকে ছোট হতে হবে

ইংরেজি সাহিত্যে পাঁচ লাইনের এই ছড়া লিমেরিকের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন "এডওয়ার্ড লিয়ার"। তাঁর বইটির নাম ছিল "A Book of Nonsense"। কিন্তু তিনি তাঁর এই ছোট কবিতাগুলোকে লিমেরিক অভিধায় ফেলেননি। লিমেরিকের ফর্মে আরও যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা হলেন...., Shakespeare, Rudyard Kipling, Alfred Tennyson, H. G. Wells, W. H. Auden, T. S. Eliot, Lewis Carroll and James Joyce....

বাংলা ভাষায় বা বাংলা কবিতায় লিমেরিক এসেছে সরাসরি ইংরেজি ভাষা থেকে। একটি ছেলে ভুলানো কালজয়ী ছড়া বাংলা লিমেরিক ধর্মী ছোট কবিতার সরল উদাহরণ....

তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা

কোলা ব্যাঙের ছা।

খায় দায়,

গান গায়,

তাইরে নাইরে না।

এডওয়ার্ড লিয়ার এর লিমেরিক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়।

সেই স্বাদের দু একটি এইরকমঃ

(১)

There was an Old Man with a beard,
Who said, 'It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!

– Edward Lear

বললে বুড়ো বোঝো ব্যাপার খানা
একটা মোরগ, চারটে শালিকছানা,
দুই রকমের হুতোমপ্যাঁচা
একটা বোধহয় হাঁড়িচাঁচা
দাড়ির মধ্য বেধেছে আস্তানা।

– (অনুবাদঃ সত্যজিৎ রায়)

(২)

There was an Old Man of Whitehaven,
Who danced a quadrille with a raven;
But they said, 'It's absurd
To encourage this bird!'
So they smashed that Old Man of Whitehaven.

– Edward Lear

কেনারাম ব্যাপারীর ভৃত্য
বায়সের সাথে করে নৃত্য।
লোকে বলে 'এইভাবে
কাকটার মাথা খাবে।
ঢং দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।

– (অনুবাদঃ সত্যজিৎ রায়)

সত্যজিৎ রায়ের নিজের লেখা লিমেরিকও ছিল তুলনাহীনঃ

বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর,
ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড়।

থোড় বড়ি খাড়া
লিখে তাড়া তাড়া,
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়।

এই সময়ের এক শক্তিশালী কবি শ্রীজাতও একটি আস্ত বই লিখেছেন "লিমেরিক" নিয়ে। তার একটি নমুনা এইরকমঃ

যতই আমি বোঝাই, এবার পড়ায় লেখায় মন দিও
কে শোনে কার কথা, কেবল দেখার নেশায় বন্দি ও
দিনরাতিয়া, অহর্নিশা
হাল ভেঙে যে হারায় দিশা –
মুখ খানা তার রাবীন্দ্রিকই, চোখ জীবনানন্দীয়

(গৃহিতঃ লিমেরিক – শ্রীজাত। প্রকাশক – পত্রভারতী)

দেখা গেছে, সাধারণত আগে যে লিমেরিক লেখা হতো তাতে তত্ত্ব, উপদেশ গভীর ভাবনা, কল্পনা, অলংকার, আধুনিক কবিতার মতো কাব্যরস কিছুই ছিলনা। শুধু ছিল ছন্দ, মিল আর ছেলেমানুষি মজা। এখন অবশ্য লিমেরিক শুধু ছোটদের আনন্দের বিষয় নয়। অনেক কঠিন ও সামাজিক বিষয়কেই শাণিত কলমে মজা মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

প্রিয় পাঠক। এইবার কলম খুলে দু একটা জম্পেশ লিমেরিক লিখে বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিন দেখি।

তন্ময় চক্রবর্তী – পেয়েছেন কৃত্তিবাস, মহাশ্বেতা দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরস্কার ও পদক। কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত ৯ টি। তারমধ্যে 'ডোভার লেনের রাত্রি' (সিগনেট প্রেস), 'আমার রবিঠাকুর' (প্রতিভাস) বিদগ্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশের নানা সাহিত্যসভায় ওনার কবিতা পাঠ বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৩২

তুমি যদি চাও — গ্রহণ লাগুক চাঁদে
সুস্থায়ী হোক পূর্ণ চন্দ্রগ্রাস
মানুষ ও মেঘ তন্ন খুঁজুক লাশ
তমসাবৃত মগজ নির্বিবাদে
ধর্ষিতা হোক লুম্পেনদের হাতে
সুন্দর তার ব্যাখ্যা হারাক ক্রমে
উপাসনাগৃহ হোক আরো থমথমে
বিধাতা বসুন ভিক্ষায় রাস্তাতে

পৃথক কবিতাল্যান্ডের স্বীকৃতি
চাইনি, চাইনি রক্ত বা সাম্রাজ্য
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ন্যাকা ন্যাকা বিবৃতির
আগুন-বয়স নেই — দুজনেই দাহ্য

সাদা পৃষ্ঠা ও কলমের প্রেম জানি
আমিও তোমাকে ভালোবাসি ততোখানি

সনেট ৩৩

তোমাকে জানাবো ঠিক করি গতকাল
বনলতা ছিলো আমার প্রথম ইয়ে
প্রেমপ্রস্তাব দিয়েছিলো সে ফিরিয়ে
নইলে আজ সে হতো বনলতা পাল
একসাথে কতো আড্ডা ও কবিতার
যুগলবন্দী, বুকের বোতাম খোলা
কথাউৎসব, স্বপ্নের পাল তোলা
শব্দের মহাদেশ বন্দর পার

ওর চোখে আমি শুনেছি লালানগান
ভুরুতে চিনেছি দোতারার মীড়-সুর
হাসলে গালের টোলে চাঁদ ম্রিয়মান
ঠোঁটে প্রজাপতি হাজার বছর দূর

বলেছে সে — এতোদিন কোথায় ছিলেন ?
বনলতা পাল নয়, বনলতা সেন ।

পল্লববরন পাল — জীবিকাসূত্রে স্থপতি । বিদেশে আন্তর্জাতিক কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চিফ্ আর্কিটেক্ট হিসেবে ২০১৮ সালে অবসর নিয়ে ফিরেছেন । সঙ্গীত নাটক চিত্রশিল্প সহ সাহিত্যের আকৈশোর হোল্‌সেল্ প্রেমিক । নয় নয় করে এ যাবৎ আঠারোটি গ্রন্থের রচয়িতা — যার মধ্যে একটি গদ্যউপন্যাস, একটি পদ্য উপন্যাস । কিন্তু আদপে এডভেঞ্চার প্রিয় আপামাথা কবি । এক টেবিলে ঠায় বসে থাকার পাব্লিক নন । নিজস্ব কাব্যিক ভাষাশৈলিতে ইদানিং প্রবন্ধ ও লিখছেন ‘অনুষ্টুপ’ ‘আরেক রকম’-র মতো নামী পত্রিকায় ।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

আসুন, গল্পটা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি

শুধু ভিড় বলে নয়। জেএফকে এয়ারপোর্ট এতটাই ছড়ানো, তার এতগুলো টার্মিনাল আর অসংখ্য গেট যে আগে থেকে বলা থাকলেও পরিচিত দুজনের মোলাকাত হওয়া মুশকিল। শুধু আচমকাই দেখা হতে পারে। হয়েছিলও তাই। এতগুলো বছর! দুই যুগের বেশি। তবু চিনে ফেললাম।

ওকে এখানে এভাবে দেখবো সেটা তো আশা করিনি। চোখ পরিচিত কাউকে খুঁজছিল না। যথেষ্ট টায়ার্ড, সারাদিন একটার পর একটা ক্লায়েন্ট মিটিং ছিল। অন্যদিন লোকজন তাও যা একটু আধটু দেখি, ইতিউতি চাই। ইন্টারেস্টিং কাউকে দেখতে পেলে ভাল করে নজর করি, এমন কি আড়ি পেতে লোকের কথাও শুনি। ওই লেখার সময় রসদ হয় আর কি। কিন্তু আজ একদমই হতক্লান্ত। সেই কোন সকালের ফ্লাইট ধরেছিলাম। অন্য মানুষের জীবন কোনভাবেই উৎসাহিত করছিল না। কোনমতে ল্যাপটপের ব্যাগটা পাশে ফেলে হয়তো চোখ বুঁজে ফেলতাম কিছুক্ষণের জন্য। পরের ফ্লাইট এখনো ঘণ্টা দুয়েক। যথেষ্ট সময়। কিন্তু সেই সময়েই খুঁজে পেলাম আমুকে।

(সত্যি বলতে এই দেখাটা হঠাৎও হয়নি, এয়ারপোর্টেও নয়। দেখাটা ট্রেনে হয়েছে লিখতে পারতাম, ভেবেওছিলাম একবার। ট্রেনে খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া এসে কপালের চুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কয়েক গুচ্ছ চোখে এসে পড়ছে তুহিনার – হ্যাঁ ওর আসল নাম তুহিনা। কিন্তু গল্প লিখতে গিয়ে মনে হল এমন একটা নাম কেমন যেন শীতলতা নিয়ে আসবে এই চরিত্রে যেটা ও কখনই ছিল না। নামের মাধ্যমে চরিত্রকে চিহ্নিত করার এই সুবিধাটা লেখকের থাকে। যা বলছিলাম, ট্রেনে হঠাৎ দেখা হওয়াটা অনেকবার ঘটেছে ছোটগল্পে। এমন কি কবিতাতেও। গতানুগতিক হয়ে যেতো। তাই বাতিল করতে হয়েছিল।

ফিরে দেখার শুরু হয়েছিল ফেসবুকে। হঠাৎ নয়, ওর নাম দিয়েই সার্চ করেছিলাম। ইন বক্সে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম অনেকদিন বাদে। শেষ যেবার কলকাতায় এলাম, সেদিন সামনাসামনি দেখা হয়েছিল ওর গানের স্কুলে। পঁচিশ বছর পরের তুহিনার চেহারাটা কিরকম হতে পারে তার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল আমার।

আচ্ছা, কেন এমনভাবে কাহিনিসূত্রটা বলে দিচ্ছি?

আমার এক পাঠিকা জিজ্ঞেস করেছিলেন একদিন, এই যে গল্প লেখেন – এসব কি আপনার নিজের চোখে দেখা? আসলে এরকম অনেকেই করেন। ছায়া পিসি কি সত্যিকারের কোন মানুষের আদলে? বাচ্চু মামা? আরলিন সালভাতোরে? কিংবা ইমন আলি? 'আমরা তারা চিনতাম' গল্পটা তো আপনারই ছোটবেলা, এরকম জোরের সঙ্গেও বলেছেন কেউ বা। তার মানে পাঠকের সব সময়ে শুধু গল্প পড়লেই হয় না, গল্পের তথ্যসূত্র জানতেও ইচ্ছা করে। খুঁড়ে দেখতে ইচ্ছে করে লেখকের জীবন। তাই ভাবলাম, দেখি না একটা গল্প লিখতে লিখতেই চরিত্রের পিছনের আসল মানুষদের সামনে নিয়ে এলে কি দাঁড়ায়। পাঠকের অনুসন্ধিৎসা পূর্ণ করতে গিয়ে গল্পটা চটকে যায় না কি গল্পের একটা সমান্তরাল উপাদান হয়ে ওঠে?

লিখছি এখন, পরে কেটে বাদ দিলেও দিতে পারি। কে জানে!)

খুঁজে পেলাম ওর হাসির জন্য। হয় এরকম কিছু লোকের। কারো যেমন মুখের মধ্যে চোখ দুটো ভাসতে থাকে মাঝসমুদ্রে পাল তোলা জাহাজের মত। একবার দেখলে ভোলা যায় না। আমুর হাসি অমনিধারা, তবে অন্য রকম।

এমনভাবে শুধু আমুই হাসতে পারত। কখনই শুধু দাঁত দিয়ে হাসত না তো আমু। চোখ দিয়ে, ভুরু দিয়ে এমন কি হাসি আটাকানোর চেষ্টায় যে বাঁ হাতটাকে ঠোঁটের সামনে আনত, সেই হাতের আঙ্গুলগুলোও সমস্বরে হাসত। অনাবিল। ওইভাবে আর কেউ হাসে না, দেখি নি তো কাউকে। কারো হাসিতে এইভাবে চারদিকে আলো ছড়ায় না।

(এটা একদম সত্যি। জাদু শব্দটা অতি ব্যবহারে খেলো। তুহিনার হাসিতে জাদু ছিল বলবো না। নির্মল কথাটা ঠিকঠাক হবে। হয়না কাকচক্ষু দিঘি যার জলে বাঁধা পড়ে চারপাশের সবকিছু কোন বিকৃতি ছাড়াই ? ওর হাসি ছিল অমনি এক মায়াময় আধার।)

এই হাসিই চিনিয়েছিল আমুকে। অবিকল সেই প্রথমদিনের মত। যেদিন অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে গেছিলাম। বহুরূপীর রাজদর্শন, মনোজ মিত্রের নাটক। আমি একাই গেছিলাম, নাটকের শেষে বাস ধরার আগে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। দেখলাম তপনকে। আসলে তপনকে দেখলাম বলা ভুল হবে। নাটকের শেষে অ্যাকাদেমির বেরোবার জায়গাটায় বেশ ভিড় থাকে, খুব উল্লেখযোগ্য চেহারার না হলে আলাদা করে কাউকে খুঁজে নেওয়া যায় না। তপন অতি সাধারণ চেহারার। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উপস্থিতিতে। তপনকে দেখার কারণ আমু। তখনো ওর নাম জানিনা। ঢেউয়ের মত বেরিয়ে আসা মানুষের দলের মধ্যে হঠাৎ যেন কেউ আলো জ্বালিয়ে ধরেছে তার হাসি দিয়ে। যদিও সবাই হাঁটছে, তার মধ্যে একটা মেয়ে হাসছে, তার চোখ হাসিতে চমকাচ্ছে, বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো হাসির মুদ্রায় পাতলা ঠোঁটে হাস্যমুখর দাঁতের সারিকে আড়াল করার চেষ্টায় খুশি উড়িয়ে দিচ্ছে খোলা আকাশে, আমার চোখ সেদিকেই চলে গেছিল। আর তখনই আবিষ্কার করেছিলাম সেই আলোকজ্জ্বল মেয়েটির পাশে, শুধু পাশে কেন ওর ডান হাত আলগোছে ধরে হাঁটছে আমাদের তপন। তপন ! হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়েছে জুতসই শব্দটা – জয় দ্য ভিভিয়ার। আমুর উপস্থিতি এমনিভাবেই আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছিল চারপাশে।

(না, সত্যিটা জানিয়ে দিই। অ্যাকাডেমিতে দেখা হয়নি। কিন্তু এই রেফারেন্সটা টানলাম নাটকের নাম দিয়ে একটা সময়ের পরিচিতি দেবার জন্য। নোঙ্গর ফেলার জন্য গল্পের একটা স্থান কাল পাত্র দরকার হয়। তাই দিলাম। তবে একটা নাটক দেখতে গিয়েই প্রথম দেখেছিলাম তুহিনাকে। চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে। সেটা নাটক শুরুর আগেই, নেহাতই লোকাল নাটক। আমি মাঝামাঝি একটা সারিতে বসেছিলাম। তুহিনা বসেছিল প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সারিতে। পিছনের সারিতে তপন ছিল, ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তুহিনা হেসেছিল। ঠিক তার পরেই টপ করে আলো নিভে গিয়ে নাটক শুরু হয়ে গেল আর সেই হাসিতে বিহ্বল হয়ে আমার নাটক দেখা মাথায় উঠল। সেই জন্যে অনেক চেষ্টা করেও ওই নাটকের নাম আমি মনে করতে পারি না, দেখিই নি ভাল করে। অন্ধকার একটু চোখ সয়ে গেলে বারবার ওই সামনের সারিতে বসা মেয়েটাকে দেখার চেষ্টা করছিলাম, যদি আর একবার পিছনে ফিরে হেসে ওঠে। কিন্তু হাসেনি। তাই নাটকের শেষে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছিলাম। যদি মেয়েটাকে না পাই, অন্তত তপনকে। হ্যাঁ, ওর সত্যিকারের নাম তপন। বদলানোর দরকার হয়নি। নামটা এত সাধারণ, ঠিক যেমন হওয়া উচিত এই চরিত্রটার। তাই বদলাইনি আর।)

এমনি সময়ে হলে নির্ঘাৎ তপনকে এড়িয়ে যেতাম, সেই মুহূর্তে নাটকটা নিয়ে ভাবতে ভাল লাগছিল। নিজের মধ্যে বিশ্লেষণ। কারো সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তপনের সঙ্গে কে এই মেয়েটা তখুনি না জানলে চলছিল না। আমি যে কারো নিরালা মুহূর্তে থাবা বসাচ্ছি মাথাতেও আসেনি তখন। হু কেয়ারস। লোকের বাধা পেরিয়ে একদম ওদের মুখোমুখি এসে পড়লাম। কি রে তপন, নাটক দেখতে এসেছিলি না কি ?

তপন দেখে বেশ খুশিই হল যেন। আরে প্রতীপ, কতদিন বাদে দেখা। কেমন আছিস ?

প্রশ্নটা মেয়েটার কাছে নিজেকে জানান দেওয়ানোর জন্য একটা উপায় মনে করে গড়গড় করে জানিয়ে দিয়েছিলাম, সময় কোথায় পাই বল। পড়াশোনার বড় চাপ। হস্টেল ছেড়ে বাড়িতেও যাওয়া হয় না কতদিন। এই তো কোনমতে সময় বের করে চলে এসেছিলাম নাটক দেখতে। কিন্তু তুই কবে থেকে কলকাতায় ?

মেয়েটার চোখে এইসময় খুশি ঝিলিক মারল। আমু সেরকম মেয়েই নয় যে পরিচয় করাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আগ বাড়িয়ে বলল, আপনি বুঝি হস্টেলে থাকেন ? কি মজা না ?

এই আমুদি, আপনি বলছিস কেন। প্রতীপ তো আমাদের ব্যাচের। যাদবপুরে পড়ে। তপনের এবার মনে হল আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। এ হল আমার পিসতুতো দিদি অমৃতা, ওদের বাড়িতে এসেছি কদিন। আমুদি বলল চল, একটা নাটক দেখে আসি।

তপনের পিসতুতো দিদি শুনে আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে ওদের হাত ধরা কোন প্রেম ভালবাসার নয়। কেন এতো তাড়াতাড়ি এই রকমের একটা কথা আমার মাথায় এসেছিল কে জানে ! প্রথম দেখাতেই একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম নিশ্চিত। তবে দিদি শুনে একটু দমেও গেছিলাম। যদিও দিদিসুলভ চেহারা আমুর মোটেই নয়। ছটফটে দোয়েলের মত হাবভাব। বেশ পাতলা গড়ন, কোঁকড়া চুলে বেঁধে ফেলা মুখের ছাঁদ লম্বাটে। কিন্তু মুখটা কেমন আলাদা করে বোঝার উপায় থাকে না যখন বিন্দু বিন্দু হাসি শিশিরকনার মত নাকে, ঠোঁটে, গালে ছড়িয়ে থাকে।

(দোয়েল কথাটা মাথায় আচমকা আসেনি। তুহিনা খুব ভাল গান করতো, অসম্ভব সুরেলা গলা। গান শোনার বাহানায় ওর বাড়িতে পৌঁছে গেছিলাম কদিন বাদেই। তুহিনার বাড়িও চুঁচুড়ায়। সেদিন রবীন্দ্র ভবনে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর তার পরদিন তপনের বাড়ি বয়ে তুহিনার ঠিকানাটা নিয়ে আসি।

তপন একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। দেখিস, আমার পিসির মেয়ে। এমন কিছু করে বসিস না।

আরে না, না গান শুনবো শুধু। শুনলাম খুব ভাল গান গায়।

এর দুইদিন বাদে আমি হাজির। সেরকম কিছু আহামরি বাড়ি নয়, অবস্থা বেশ খারাপই বলবো। তুহিনা আমাকে দেখে একটু অবাক হলেও, হাসিটা অমলিন। তপনের বন্ধু মা, সেদিন দেখা হল নাটক দেখতে গিয়ে। তুহিনার মা অচেনা একটা ছেলে এসেছে বলে যে খুব চমকে গেছিলেন সেরকমটা নয়। বারিন বলে আর একটা ছেলেও বসে ছিল। জানলাম তুহিনার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে, সকাল থেকে ওদের রেওয়াজ চলছিল এতক্ষণ। বারিন চলে যেতে তুহিনা এসে বসল একটা মোড়ায়, ওর মা একটা মামলেট আর চা নিয়ে এলো।

শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে ওর মা বলল, সারাদিন এত দলবল আসে তুহিনার, আমি কিছুতেই নাম মনে রাখতে পারি না। কি যেন নাম বললে তোমার ?)

আমু বলল,ও মা ! তাই নাকি। জানিস তো আসছে সপ্তাহে আমি তোদের কলেজে গান গাইতে আসছি।

আমু পরে বলেছিল, না রে বাবা, এটা তোর সঙ্গে দেখা করার কোন প্রস্তাব ছিল না। তোদের কলেজের সুবীর বলে একটা ছেলে আমাদের কলেজ ফেস্টে এসেছিল আর আমাকে তখন থেকে পইপই করে বলতো যাদবপুরের অ্যানুয়াল ফেস্ট যেন আমি মিস না করি। তপন যেই বলল তুই যাদবপুরের, সেটাই তো মাথায় আসবে তাই না ?

আমুর চোখের সাদাটা ছিল একদম স্বচ্ছ, তার মধ্যে কালো মনিটা এমন বিশ্বাসে চকচক করতো যে ওর কোন কথায় সন্দেহ করাটা অসম্ভব ছিল আমার জন্য। আমু যখনই কথা বলতো, ওর চোখ অন্যের চোখকে যেন নিজের দৃষ্টিতে বেঁধে নিত একেবারে। ছটফটে জাপটে ধরার মত করে নয়, আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে একে অপরকে ছুঁয়ে থাকার মত। এই অন্তরঙ্গতা সবার সঙ্গে, এমন কি পথে যেতে কোন ভিখারির থালায় খুচরো পয়সা দিতে গিয়েও। একবার বলেছিলাম ওকে, তোমার যাওয়ার পথে এমনি থালা হাতে বসে থাকবো এবার থেকে। একথা শুনে আমুর সেই হাসি জুঁইফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তুই বড্ড হিংসুটে তো, আমার সব হাসি খাঁচায় ভরে দিতে চাস। তারপরেই গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠেছিল, খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে – আচ্ছা, তোর দাঁড়ে বসা পাখিকে দানা খাওয়াতে ভাল লাগে নাকি উঠোনে খাবার ছড়িয়ে যে আসে তাকেই ?

কি বলতে চেয়েছিল আমু সেটা তখুনি স্পষ্ট বুঝিনি। কিংবা কখনোই বুঝিনি। পরবর্তীকালে স্পষ্ট করে এই কথাটার একটা মানে করে নিয়েছিলাম সেটা সত্যি। কিন্তু সেও তো অনেক পরের ব্যাপার।

প্রথম দেখা হওয়ার দিনে এসব কোন কথাই হয়নি। আমি বরং হামলে পড়ে বলে উঠেছিলাম, তাই নাকি ? দারুন ব্যাপার ! তপন, তুইও কি আছিস তখন ? চলে আসিস না একসঙ্গে আমাদের ওখানে, বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে।

না, আমি থাকবো না অতদিন। এই তো পরশু বাড়ি ফেরার কথা আছে।

শুনে কি খুশি যে হলাম ! মুখে যদিও বলেছিলাম, যাঃ, কতদিন বাদে একটু দেখা হত। আমুর দিকে ফিরে বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি যদি জানাও কবে আসছো।

হাসিটা আবার ফুলঝুরির মত মুখকে রোশনাই করল। ও মা, তোদের কলেজের ফাংশান। আমার থেকে তোর তো বেশি জানার কথা। দেখে নিস একদিন সব কলেজের মধ্যে গানের কম্পিটিশান আছে, সেইটাই। কবে কখন সেটা আমার এই মুহূর্তে মনে নেই মোটেই।

পরের দিনই দিনক্ষণ সব জেনে নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, জি এসের সঙ্গে কথা বলে গানের প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশান কাউন্টারে বসার কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলাম। কাউন্টারে ছিল আরেকজন – খেয়ালিদি। শুরুতেই জিজ্ঞেস করল, তুই গানটান গাস ?

জানতে লাগবে নাকি ? আমি গান সেরকম বুঝি না। মনে মনে ভাবলাম, শুধু আমু আসছে বলেই না বডি ফেলেছি।

আরে না, না। গান গাইতে না জানাটা তোর কোয়ালিফিকেশান। আমি একটু সিওর হয়ে নিতে চাইছিলাম। গতবারও আমি এই কাজে ছিলাম। আমার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল, বিতান। ভিতরে উঁকি মেরে দুজনের গান শুনেই ওর বুক চিতিয়ে উঠল। হাম কিসিসে কম নাহি। আম্মো গানা গায়েগা। নিজের নাম রেজিস্টার করে ফিল্ডে নেবে গেল। তারপর আমাকে পুরো একা সামলাতে হয়েছে। হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল খেয়ালিদি।

আমার উদ্দেশ্যটা জানলে হাসি জ্বলবে না বুজবে কিনা জানিনা, কিন্তু আমি চেপে গেলাম। আমু এলে দেখা যাবে খন।

ছেলে মেয়েরা আসতে শুরু করেছিল। কলকাতার অনেক কলেজ থেকেই আসছে। সবার যে আগে থেকে নাম লেখান আছে তাও নয়। একটু ব্যস্তই ছিলাম। সবার নাম ঠিকানা কলেজের নাম লিখে একেকটা নাম্বার লেখা ট্যাগ হাতে ধরিয়ে দেওয়া। ঘাড় গুঁজে লিখছিলাম এইসব, হঠাত অমৃতা রায় নামটা শুনে মুখ তুলে দেখি আমু। কমলা রঙ্গের একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ কাঁধে, সবুজ শাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে খেয়ালিদির সামনে। বুকের কাছে জড়ো করা হাতে একটা ডায়েরী। আমাকে দেখেই হাসিতে ছড়িয়ে পড়ল। আরে, সেদিন বললি কবে গানের কম্পিটিশান তার দিনক্ষণ জানিস না, আর নিজেই এখানে বসে আছিস ? কি মিথ্যুক ছেলে রে বাবা !

আমু হাসলেই চারদিকে পাঁচশো ওয়াটের আলো। তার ছটা চারপাশের লোকের উপরেও চলকে পড়ে। আমার উপরে অবশ্যই। আমু ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর সেটাই বলেছিল খেয়ালিদি। এইজন্যে এসে বসেছিস ? তোর মুখটা যেমন চমকাল, কোন কেস আছে মনে হয় ?

বুকে তখন দ্রিদিম দ্রিদিম। মুখে বলেছিলাম, ধ্যাত কি যে বলো। আগে একবার দেখা হয়েছিল, ব্যাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি মনু। তুমি খেয়ালির চোখকে ফাঁকি দেবে অত বড় ডুব সাঁতারু এখনো হওনি। মন চাইলে লড়ে যা। তোকে পাত্তা দেবে কি না জানিনা, কিন্তু লজ্জা শরমের তোয়াক্কা না রেখে বডি ফেলে দে। বেশীরভাগ রেজিস্ট্রেশান তো হয়ে গেছে, কম্পিটিশান শুরু হল বলে। তুই ভিতরে গিয়ে একটু লাইন মারার চেষ্টা কর, আমি এদিকের লাইন সামলাচ্ছি।

একা ছেড়ে চলে যাবো, তাই একটু বাধোবাধো লাগছিল। এই কথার পরে আর অপেক্ষা করিনি। ভিতরে বেশ ভিড়। একেবারে টইটম্বুর। অবশ্য এর মধ্যে অনেকেই প্রতিযোগী। বিচারক কাউকে চিনি না। একেকজন গাইবার আগে যেভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে প্রণাম ঠুকছে, নামজাদা কেউ থাকতে পারে। আমার চোখ খুঁজছিল আমুকে। তিন নম্বর সারির একদম কোনায় খুঁজে পেতেই বুকটা ধক করে উঠছিল। একমনে গান শুনছে। কিংবা এভাবেই হয়তো ফোকাস করছে নিজেকে। মাথা নীচু করে সামনের সারিটা ক্রস করতে পারলেই আমুর কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু এমন কিছু গা ঘেঁষাঘেঁষি আলাপ তো নেই। দুম করে কথা বলতে গিয়ে ওর মনঃসংযোগ নষ্ট করে লাভ নেই। গান হয়ে গেলে না হয় একবার চেষ্টা করবো, এমনটাই ভাবছিলাম।

কেউ টানা তাকিয়ে থাকলে মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। আমু হঠাৎ চমকে চোখ তুলে তাকাল। চোখ একদম সোজা আমার উপরে। চোখে প্রশ্ন। ভুরুটা ধনুক এঁকেই পরক্ষণেই সমান। কি করবো ? হাসবো ? মনে আছে থতমত খেয়ে নিজের বুড়ো আঙ্গুল উপরে তুলে থাম্বস আপ দেখিয়েছিলাম।

আমুর মুখ এবার হাসিতে ভরে গেল। হাসলে ওর চোখ দূর থেকেও হ্যাজাকবাতির মত চকচক করে।

আমু ওর হাত দেখাল, তর্জনী ঘুরিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছে। কি বলছে ? এবার ঠোঁট সরু করে কি একটা নিঃশব্দে বলল। সেটাও মাথায় ঢুকল না। কিছু একটা বলতে চাইছে। যা থাকে কপালে ভেবে পিঠ বেঁকিয়ে ঘাড় নিচু করে সামনের সারির সকলের হই হই উপেক্ষা করতে করতে এক ছুটে তিন নম্বর সারিতে লাফ দিয়ে উঠে গেছিলাম সেদিন। ভাগ্যিস আমু একদম কোণায় বসেছে। পোডিয়ামে যেতে সুবিধা হবে বলেই বোধহয়। আমু হাসছিল। আমি হ্যা হ্যা করে হাঁফাচ্ছিলাম। আমু ওর বাঁ হাতের পাতা দিয়ে আমাকে নিচু হতে বলল। হলুদ রঙ্গের নেলপলিশ লাগানো আঙ্গুলগুলো যেন শিল্পীর একগোছা তুলি। মাথা নীচু করে কানটা একদম নিয়ে গেছিলাম আমুর মুখের কাছাকাছি। মুখ থেকে এলাচের হালকা গন্ধ। কি পারফিউম মেখেছিল কে জানে ? মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। আমু ফিসফিস করে বলল, তুই কি গরু রে। তখন থেকে বলছি গানের পরে থাকিস, কথা বলবো !

শুধু তর্জনী দিয়ে কি করে এতগুলো কথা বলা যায় আমি জানতাম না। অন্তত এরকম সাঙ্কেতিক কথা বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম সুখ বোধহয় এরকমই হয়। এক অদ্ভুত আনন্দ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু বাদেই অমৃতা রায়ের নাম ডাকল। আমু গ্যালারি দিয়ে এক এক ধাপ করে নেবে আসছে, আমার চোখ ওর প্রতিটা পদক্ষেপ অনুসরণ করছে। তখনই কি আমি আমুকে ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছিলাম ? ভালবাসায় এতো কষ্ট! এতো আনন্দ!

আমু মঞ্চে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। আলগোছে নমস্কার করে হারমোনিয়ামটা টেনে নিল। দাঁড়িয়ে আছো তুমি, আমার গানের ওপারে।

আমি আপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। গান শেষ হয়ে গেছিল, অথচ একটুও নড়তে পারি নি। আমু কখন নেবে এসে আমার জামার হাতা ধরে টান দিয়েছে। কি রে, কেমন ?

ওকে দেখেই জিভে দুষ্ট সরস্বতী ভর করল। আমি গাইতে জানলে এখন কি গাইতাম বলো তো ? ও চাঁদ, সামলে রেখো জ্যোৎস্নাকে।

তুই তো মহা ফাজিল ছোঁড়া! আমি গান কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আমু চোখ পাকালেও কি ভাল যে লাগে ! দমে না গিয়ে বললাম, ভুল কি বললাম আমু ! তোমার সুর যে জ্যোৎস্নার মত অকৃপণ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আমু কিরে, আমুদি বল। তপনের দিদি হই না আমি ? আমু ওর গভীর কালো চোখের ছায়া আমার মুখে ফেলে দাঁড়িয়েছিল।

যদি আমোদিনী বলি ? দি আছে কিন্তু এর মধ্যে।

আমু খপ করে ওর ডান হাতে আমার কব্জিটা পাকড়াও করল। এই ছেলের মুখে তো একেবারে ফুলঝুরি দেখছি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিস নাকি লেখক রে তুই ?

আমি লিখতাম তখনো, সেটা সত্যি। কিন্তু কলমে যেমন ঝরঝরিয়ে বেরোতো, মুখে আমার মোটেই এমন বইত না। কেন কে জানে আমুর সামনে এসেই আমার মুখের তালাচাবি উধাও। যেন কতদিনের পরিচয়, কথা বলায় কোন অর্গল থাকছিল না। বললাম, কেন যে মেয়ে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না ?

চল তাহলে তোর লেখা শোনাবি।

আজ নয়, আরেকদিন। আজকে বরং তোমাকে কফি খাওয়াই আমাদের ক্যান্টিনে।

কিন্তু আরেকদিনের দেখা হওয়ার হিসেবটা পাকা হয়ে গেছিল ওইভাবেই।

(তুহিনার সঙ্গেও একবার আমার কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা হয়েছিল। কিন্তু ফেস্টের সময় নয়। এমনি আচমকা। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে নেবে অরবিন্দ বিল্ডিঙ্গের দিকে চলেছি তখন, হঠাৎ দেখি তুহিনা। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ, পরনে শাড়ি। একা হাঁটছিল, পাটা একটু টেনে টেনে। দেখেই চমকে উঠেছিলাম। এখানে এখন ?

তপনের কাছ থেকে খবর নিয়ে সেই যে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম অযাচিত ভাবে, তারপর আর দেখাও হয়নি। আমার মনে হয়েছিল আমি যে দুদিনের মধ্যে তুহিনার বাড়িতে পৌঁছে গেছিলাম সেটাই তো যথেষ্ট আমার উৎসাহটা জানান দেওয়ার জন্য। আমি ভেবেছিলাম তুহিনা এতেই গলে যাবে। কিন্তু তুহিনা এসব কিছুই করেনি। ঠিক একই রকম উচ্ছলতায় আমার এবং বারীনের সঙ্গে কথা বলছিল। একই খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল ওর চোখে মুখে। আমার মনে হচ্ছিল এখন ওর বাড়ির বেড়া ডিঙ্গিয়ে যদি একটা ছাগল ঢুকে যায় বাড়িতে, ঠিক এমনি সাদর হাসিতে শকুন্তলা সেজে তুহিনা ওকে কোলে তুলে নেবে।

আমার খুব হিংসা হচ্ছিল। এলাকায় আমার ভাল ছেলে বলে নাম ছিল, আমি কোনদিন এরকম আগ বাড়িয়ে কোন মেয়ের কাছে দৌড়ে যাইনি তো। কেন যেন মনে হয়েছিল, আমি যে গেছি সেটাই যথেষ্ট। অথচ তুহিনা সবাইকে যেমন হাসি বিলোয়, টুপটাপ ঝরে পড়া ওর কথাগুলো সবার জন্য সমান, যেমন ভোরের প্রথম আলো মন্দিরের চুড়ো অথবা ভাঙ্গা আটচালা নির্বিশেষে উজ্জ্বল করে তোলে। তুহিনা কোনভাবেই খারাপ ব্যবহার করেনি, কিন্তু আমার মনের নিরাশ ভাবটা ফুলতে ফুলতে এমন বড় হয়ে গেছিল, আমি হঠাৎ – এই যাহ, একটা কাজ আছে যে আমার বলে উঠে চলে এসেছিলাম। আবার কোনদিন দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা তৈরী না করেই। এরপর এমন একটা লজ্জা আমাকে গ্রাস করল, আমি নিশ্চিত হলাম তুহিনা আমার পিছনে হাসাহসি করেছে, হয়তো বলেছে অন্য কোন বন্ধুকে, রেগেই আছে আর কিছু না হোক। এরকম কোন প্রমাণ যদিও আমি পাইনি, এই ঘটনাই যে ঠিক ঘটেছে সেই বিষয়ে আমি কেমন নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম। তাই ইচ্ছা থাকলেও আমার আর ওর বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

তুহিনাকে কলেজে দেখতে পেয়ে অযাচিতভাবে সেই ভুল শোধরাবার সুযোগটা এসে গেছিল।

তুহিনাকে নিজের কলেজের ক্যাম্পাসে দেখে ভিতরটা ছটফট করে উঠল। আমাকে দেখে তুহিনাও খুশি হল। আরে, তুই এখানে ?

আমার তো এখানেই থাকার কথা। বরং তোমাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেছি তো।

তুহিনা একটু লজ্জা পেলো। সেটা আমি যে এখানে পড়ি এই কথাটা ভুলে যাওয়ার জন্যে নাও হতে পারে। আবার হতেও পারে। আসলে ওর পরের কথাটা বলার ভাবনাতেও লজ্জা পেয়ে থাকতে পারে। বলল, তুই সুবীরকে চিনিস ?

কে সুবীর ?

তোদের কলেজেই পড়ে, সুবীর তালুকদার।

এতো ছেলে পড়ে এখানে তুহিনা, কি করে বলবো। হস্টেলের ছেলে হলে তাও চেনার চান্স ছিল। কোন ডিপার্টমেন্টে ?

হস্টেলেই তো, তোদের এখানে একটা নিউ ব্লক হস্টেল আছে না ? সেটায়।

ও, তাহলে একটু হাঁটতে হবে। নিউ ব্লক পুরো কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে গেলে তার পর। কে সুবীর, তোমার কেউ চেনা ?

হ্যাঁ, চিনেছিলাম এক গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে। কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেছিল তুহিনা। তারপর আবার একমুখ হেসে বলল, এই তোর দেরী হয়ে যাচ্ছে না ক্লাসের ?

আরে, বাদ দাও। এরকম অনেক ক্লাস মিস হয়। চলো আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। আচ্ছা, তোমার পায়ে কি হয়েছে ? হাঁটবে কি করে অতটা ?

এবার প্রাণভরে হাসল তুহিনা। জানিস তো কি হয়েছে। যেই না বাস থেকে নাবলাম, ফট করে চটিটা ছিঁড়ে গেল। একটা সেফটিপিনও নেই যে আটকে নেবো।

ও, তাই নাকি ? তাহলে চুপ করে বোসো এই লাল চেয়ারে। আর চটিটা আমাকে দাও, সারিয়ে আনি আগে।

ধ্যাত, তুই আমার চটি কেন হাতে করে নিয়ে যাবি ?

তাতে কি, এই তো গেটের বাইরে একটা মুচি বসে, আমি জানি।

তাহলে চল, আমিও যাচ্ছি।

সেদিন সুবীরের দেখা পাইনি। নিউ ব্লকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সুবীর বলে ছেলেটা যাদবপুরে মাস্টার্স করছিল। এখন চাকরি নিয়ে মাদ্রাজ। ওর একটা ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছিলাম তুহিনাকে। তারপর বাসে তুলে দিলাম।

সেদিন চটি সারাতে দিয়ে এইট বি বাস স্টপে চা খেয়েছিলাম পাশাপাশি, চায়ের পরে সিগারেট ধরাতেই খপ করে আমার হাত ধরেছিল তুহিনা। অ্যাই, সিগারেট খাস কেন রে ? দে, ফেলে দে। ফেলে দিয়েছিলাম। একটু বাদে ভিড় রাস্তা পার হওয়ার সময় ওর ডান হাতের মণিবন্ধ ছিল আমার মুঠোয়।

শুধু সুবীর বলে ছেলেটাকে খুঁজতে এতদূর কেন এসেছিল জিজ্ঞাসা করিনি। বরং সুবীরকে পাওয়া যায়নি বলে, এক অজানা কারনে আমার মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠেছিল। লোকের ভারে ধুঁকতে ধুঁকতে ১৭বি বাসটা যখন আসছে, তুহিনা আমাকে বলেছিল অ্যাই আমাকে দিদি বলিস না কেন রে ? আমি তপনের দিদি না ?

উত্তরটা পরের দিনের জন্য জমা থাকুক।

পাদানিতে দাঁড়িয়ে সেদিনের শেষ হাসিটা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, বাড়ি এলে আমাদের ওখান থেকে ঘুরে যাস একবার।

আরেকবার দেখা করার ব্যবস্থাটা এইভাবে পাকা হয়েছিল।)

আমুকে শোনাব বলে একটা নতুন লেখাই ফেঁদে ফেলেছিলাম। কবিতা, আমোদিনীর সঙ্গে জ্যোৎস্নাযাপন।

যথাসময়ে লেখার দুপাতা পকেটে পুরে আমুর বাড়িতে উপস্থিত। সত্যি বলতে একটা প্রবল উত্তেজনায় দুপুরের খাবারটাও ভাল করে খেতে পারিনি। আমুদের বাড়ি পদ্মপুকুরে, পুরোন বাড়ি। হয়তো অনেক শরিকের। কিন্তু আমি দমে গেলাম যখন গিয়ে দেখলাম ঘরে আরো চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে হইচই করছে।

এই দ্যাখ, আমার এক নতুন ভাই। তপনকে দেখেছিলি তো ? ওর ছোটবেলার বন্ধু। প্রতীপ। ইঞ্জিনীয়ার, আবার লেখালেখিও করে।

আরেব্বাস তাই নাকি ? একটা চশমা পড়া মেয়ে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। কি লেখো ভাই ?

ভাই ভাই শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। এখন যে মেয়েটা বলল, বেশ ছোটখাটো চেহারার। দেখে মনেও হচ্ছিল না আমার থেকে বড় বলে। তপনের বন্ধু বলে ভেবেছে মফস্বলের ছেলে, মুরগী করি। ফস করে বললাম, প্রেমপত্র।

ঘরে হাসির রোল উঠল। একটা ছেলে কাত হয়ে বিছানায় শুয়েছিল। উরি শালা, তুই তো মহা ঘাঘু রে। তোর কটা প্রেমিকা ?

বেশ একটা জ্যুতসই জবাব দেওয়ার খুশি গলায় নিয়ে বললাম, আমার প্রেমিকার জন্য না। আমি যা লিখি, অন্যেরা প্রেমপত্র বলে চালায়।

পারি না ! শোনা, শোনা। আমি আমুকে প্রেম নিবেদন করবো বলে কবে থেকে ভাবছি, খাপচু করে একটা ভালবাসার চিঠি লিখতে পারছি না বলে কেঁচে যাচ্ছে। ছেলেটার পরনে জিনস আর পাঞ্জাবি, উঠে দাঁড়ালে দেখলাম আমার মাথায় মাথায়। যতরকমে পারছিলাম মেপে নিয়েছিলাম নাম জানবার আগেই। ইয়ারকি মারছে নাকি সত্যিই ও আমুর প্রেমিক ? আমুর মুখের দিকে তাকালাম, কোন হেলদোল নেই।

তাহলে ভেবে দেখতে হবে। খুব গম্ভীরমুখে বললাম।

খুব হাসির রোলের মধ্যে বসার জায়গা পেলাম। সবার সঙ্গে চটপট আলাপও হয়ে গেল। অনিন্দ্য, সুশ্যামল, অতীন্দ্র, নয়নিকা, পুতুল। ভালই ছেলে মেয়েগুলো। মোটা গোঁফের সুশ্যামল একটু গম্ভীর টাইপ। বয়সেও বোধহয় একটু বড়। অনিন্দ্যটা ছ্যাবলা টাইপ, কথা বলতে বলতে নিশ্চিন্ত হলাম ওর সঙ্গে আমুর প্রেম হতেই পারে না। এদের কেউ আমুর সঙ্গে গান গায়, কেউ ওর কলেজের বন্ধু। এইসব।

গল্প করলেও আমি পকেটের লেখা বের করলাম না। আমু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আমি বললাম এই যাহ্, লেখাটা আনতেই ভুলে গেছি। তখনকার দিনে তো আর মোবাইল ফোন ছিল না, সব কিছু হাতে লেখা। চা মুড়ি খাওয়ার পরে বন্ধুরা একে একে চলে যাওয়ার পর আমু বলল, ধুর তোর সঙ্গে আর কথা বলবো না।

শুনেই বুকটা কেমন ধক করে উঠল, কেউ যেন সযত্নে রাখা প্রদীপের সলতেতে ফুঁ দিয়ে দিল একেবারে। কেন আমু কেন ?

কথা দিয়ে কথা রাখিস না মোটে। আমুর চোখ মায়াক্লিষ্ট, একেবারে বুকের ভিতরটা অবধি পড়া যায়। ও যদি বলে আমার লেখা শুনবে বলে বসেছিল, সেটা শতকরা একশো ভাগ সত্যি। মাত্র দুদিন আলাপেই, আমি সে ব্যাপারে কেমন একটা নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম। তাই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বুক পকেট থেকে ফুলস্কেপ কাগজটা টেনে বের করলাম। এই যে, বান্দা হাজির। কবিতাটার নাম কি জানো ? আমোদিনীর সঙ্গে জ্যোৎস্নাযাপন।

আমুর মুখে সঙ্গে সঙ্গে একশোটা ঝাড়বাতি। তারপর ধীরে ধীরে বলল, যারা কথা রাখে না, আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারি না আর। মনে থাকবে তো প্রতীপ ?

আমু হাঁটুতে কনুই রেখে দুই হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল জুড়ে তার উপরে থুতনি ভাসিয়ে আমার দিকে চেয়েছিল, আমি পড়ব বলে। হাতে কাগজ ধরা থাকলেও, আমার তো মুখস্ত হয়ে গেছিল লেখাটা। আমুর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি পড়ছিলাম।

জোনাকি আর চাঁদের সঙ্গম হলে
নাকি মুক্তোপাত হয় !

ডানাকাটা পরীরা
ঘুরে বেড়ায় মসৃণ জ্যোৎস্নায় –
সোনা-রঙ নৌকোর মেঘ
ভেসে আসে, আলোর নদীর স্রোতে;
রূপ-টানে মুছে যায় ক্লেদ ।

শান্ত হাওয়া,
স্তব্ধ সন্ধ্যার নীল চোখে,
তিরতির ঢেউ,
স্বপ্নে পায়, প্রেরণার ভাষা।

হাওয়া ওড়ে ...
হাওয়া ওড়ে ...
দুঃখ ছিঁড়ে উঠে আসে মানুষ,
মৃত্যু ফিরে যায় ।

সেই আলো,
সেই ঢেউ,
এখনও দেখিনি আমি।

তবে, যেদিন তুমি
আমার ভাঙ্গা ঘরের বারান্দায়
প্রথম রাখবে পুষ্পের পা –
সেদিন ওমনি জ্যোৎস্না হবে,

আমোদিনী। আমুর সঙ্গে সেদিন নিয়ে মোটে তিনবারের দেখা। কিন্তু প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকেই কি এক অমোঘ আকর্ষণে আমি ছুটে যাচ্ছিলাম। কতটুকুই বা চিনি ? অথচ দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার পর আমি নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম আমার চাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু আমু ?

কবিতাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুটা সময় আমু কোন কথা বলেনি। পলকহীন তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, আমি তপনের থেকে দুই বছরের বড়। জানিস তো সেটা ?

আমার বাবা আমার মায়ের থেকে দশ বছরের বড়। ওদের দুজনের প্রেম দেখলে তুমি চমকে যাবে।

ধ্যাত ! বলে এবার খিলখিল করে হেসেছিল আমু। তারপর বলল, তুই ছেলেটা খুব পাজী, কথার প্যাঁচ জানিস খুব।

কথা বেচেই খাস এখনো ? আমু নিজের হাতের বইটা মুড়ে পাশের চেয়ারটায় রেখে বলল।

এয়ার পোর্টে দেখা হতে খুব অবাক চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে এই কথাটাই প্রথম বলেছিল আমু।

সেটা পুরোপুরি সত্যি নয়। মানে এর আগে আরও দুই একটা শব্দ এসে থাকবে, কিন্তু এটাই প্রথম কানে আটকে থাকার মত শব্দমালা। আমু চলে যাবার পরেও কানের লতিতে আটকে ছিল।

(তুহিনার সঙ্গে পরের বার দেখা হয়েছিল চুঁচুড়ার ডাচ গোরস্তানে। ওকে নিয়ে কবিতা লিখিনি কোন, আমি আদৌ কবিতা লিখিই না। এই কবিতাটি কবি উদ্দালক ভরদ্বাজের, গল্পের প্রয়োজনে ধার নেওয়া। গোরস্তানে দেখা করার কারণটাও নেহাতই গদ্যময়। কারো চোখে পড়তে চাইনি। ওর বাড়িটাও অ্যাভয়েড করেছিলাম। আর কে কে ঘর আলো করে থাকবে জানা ছিল না তো। সন্ধ্যা নেবে আসছিল, শঙ্কু আকৃতির প্রাচীন কবর স্মারকগুলো ঘনায়মান অন্ধকারে মানুষ মানুষ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জানতাম জ্যান্ত মানুষ ওই সময়ে ওখানে আসবে না কেউ।

কিন্তু ওখানে দেখা করতে চাওয়ার আর একটা কারণ ছিল। কোন মেয়ে কেন আসবে ওরকম একটা জায়গায় যার তার সঙ্গে, অন্তত আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ? দেখতে গেলে আমার পদক্ষেপগুলো বেশ হিসেবীই ছিল।)

আমি আমুকে দূর থেকে দেখেই ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মোবাইলে কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসছিল, আলগোছে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে গেছিল ঠোঁটের সামনে। নারকেল গাছের পাতা যেমন চাঁদের জ্যোৎস্না আটকাতে পারে না, ওর হাসিও তেমনি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে চলকে বেরোচ্ছিল। ফোনটা কানের থেকে সরাতেই এক পা এগিয়ে ওর সামনে এলাম। আমু !

চোখ তুলে চেয়ে ভুরুটা উপরে তুলে আমাকে দেখতে দেখতে বলেছিল, আরে প্রতীপ ! তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল, কথা বেচেই খাস এখনো ?

ভাবলাম আমার লেখা পড়েছে বুঝি আমু। হাসিটা নিজের অজান্তেই স্মিত হয়ে গেল, বাংলায় গল্প লিখে কেউ খেতে পারে নাকি ?

ও তাই নাকি ? তুই এখনো লিখিস ? খুব একটা বিরতির পর বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তোর গল্প কোথাও দেখেছি বটে – আমুর হাসিতে বয়সের কুয়াশা ঘিরে ধরতে পারেনি। কিন্তু চোখের কৌতুক অভিজ্ঞতায় ধারাল হয়েছে। আগে ওর কথাগুলো ঝরঝরিয়ে বেরোতো। এখন অনেক মেপে। কবিরা বয়েস বাড়লে গদ্যকার হয়ে যায়, নারে ? এটা কোন উত্তরের অপেক্ষায় করা প্রশ্ন নয়। কারণ তারপরেই বলল, আমি ভেবেছিলাম তুই বোধহয় কোথাও মার্কেটিং জবে আছিস, ধরাচুড়ো দেখে ওরকম মনে হচ্ছিল।

সেটাও ভুল নয়। ক্লায়েন্টের অফিসে টুঁ মেরে বাড়ি ফিরছি। বসি এখানে ?

বসে ল্যাপটপ ব্যাগটা চেয়ারের পাশে ঝুলিয়ে বললাম, আমি লিখতাম, এখনো লিখি। তুমি গান করতে এতো ভাল। এখন ?

খুব একচোট হাসল আমু। বেশ আড়ম্বর করে, এতোটাই যে সত্যি না নকল তাই নিয়ে সন্দেহ হতে পারে। এমনি লোকের হবে না, কিন্তু যে একবার ঝর্ণার জল খেয়েছে, বোতলের জলের সঙ্গে পার্থক্যটা চট করে বুঝে ফেলে। হাসলে আমু এখনো ঠোঁটের সামনে আঙ্গুলগুলো ময়ূরের পেখম মেলার মত মেলে ধরে। মুখ থেকে হাসিটা মুছে নেওয়ার ভঙ্গিতে আঙ্গুল সরিয়ে বলল, মনে আছে তুই আমাকে ইম্প্রেস করার জন্য কিরকম রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত সেজেছিলি।

ভক্ত কেন সাজবো ? কোন বাঙ্গালির ছেলেমেয়ে ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেনি? হ্যাঁ, তোমার গান শুনতে শুনতে হয়তো উৎসাহটা বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন তো আর শুনিস না, তাই না ? এমন ভাবে বলল যেন 'ঠিক জানি' এই শব্দজোড়া না বলেও স্পষ্ট শোনা গেল ওর উচ্চারণে।

মেনে নিতে হল। খুব কম শোনা হয়। শুধু বাইরে আছি বলে নয়, হয়তো আমুই ঠিক। আমি রবিঠাকুরের গানের সেরকম ভক্ত ছিলাম না, আমুর সঙ্গে পরিচয়ের দিনগুলোতে হয়তো একটু বেশি বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম। তুমি কি গুনতে জানো ? এমন ভাবে বলছ না – পুরোপুরি মেনে নিলে যেন নিজেকে মেকি বলে মেনে নেওয়া হবে।

নারে আমি ওরকমভাবে মনের কথা পড়তে পারি না। কবি লেখক এদের অনেক বেশি ইনসাইট থাকে এসব ব্যাপারে। আবার হেসেছিল আমু। কিন্তু এই হাসি যেন শুধুই কোন চোরাগোপ্তা হামলার মোড়ক। কতকাল আগে বলা ওর কথাগুলো কানে ঝনঝন করে উঠেছিল, কেন তুই কি আমার মনের কথা পড়ে রেখেছিলি ? আমি তো কোনদিন সেরকম কিছু বলিনি।

আমি রাগে অভিমানে বাঁশপাতার মত কাঁপছিলাম সেদিন। আমার দুই হাতে শক্ত করে ওর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিলাম। সত্যি করে বলো আমু, তুমি কি আমাকে ভালবাসনি, পুরোটাই আমার মনের ভুল ?

সারাদিন এতো ধকল গেছে, খুব টায়ার্ড লাগছে রে। ওর ডান হাত দিয়ে আমার হাত ওর কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিল। গলায় সত্যিই একরাশ ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছিল আমুর। কেমন একটা শারীরিক দূরত্ব তৈরী করে ফেলছিল, যদিও এমনিতেই আমার থেকে দুই ফুট দূরেই দাঁড়িয়ে, তবু আলাদা করে সেই চেষ্টাটা বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছিল ও যেন আমার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে, আর কোনদিন ছুঁতে পারবো না। আমার বুকের মধ্যে একটা ডুবন্ত মানুষের অনুভূতি হচ্ছিল। আমার গলায় সেই ছটফটানিটা ছিল। আমি জানতে চাই আমু, প্লিজ।

এখনো কতটা ফিরতে হবে বলতো ? মা খুব চিন্তা করবে, এসব কথা পরেও হতে পারে।

আমুর মাকে যতটুকু জানতাম সত্যিই অত চিন্তা করবে বলে মনে হয়নি আমার। একদিন চায়ে চুমুক দিতে দিতে ওনাকে বলেছিলাম, আমু সারাদিন টইটই করে ঘোরে আপনার চিন্তা হয় না ?

আমুর মা বেশ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে, কিন্তু মুখে কিছুই বলেনি। উত্তর না পেলে কথা হাওয়া ছাড়া বেলুনের মত চুপসে যায়, আমি সেই বেলুনে হাওয়া ভরার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলেছিলাম, মানে এতরকমের ছেলে মেয়ে আসা যাওয়া করে আমুর কাছে – তুমিও তো আসো, বারণ করবো ?

হেসেছিলেন উনি, কিন্তু আমুর হাসির মত আলো জ্বালানো হাসি ছিল না সেটা।

তাই জানতাম ওরা মা মোটেই চিন্তা করছেন না। তবে অনেকটা দূরেই গেছিলাম সেদিন। আমুর গানের প্রোগ্রাম ছিল সল্ট লেকে, সেখান থেকে আমাদের কলকাতায় ফিরতে এক দেড় ঘণ্টা লাগে। আমি তখন ওর সঙ্গে এরকম অনেক গানের প্রোগ্রামে যেতাম।

আমি তখনো ছাড়তে রাজি ছিলাম না। আমি তাহলে তোমার সঙ্গে কেন সব জায়গায় যাই, কেন আসি যেখানে তোমার গানের প্রোগ্রাম হয় সেখানেই ?

পুরো চোখ মেলে তাকিয়েছিল আমু। আচ্ছা, কি বোকা ছেলে রে। তুই কেন আসিস, আমি কি করে জানব ? তুই আসতে চেয়েছিস, আমি না করিনি।

ও, আমার আসা না আসায় তোমার কিছু যায় আসত না ?

আমি কি একবারও সেই কথা বলেছি ? আমি জোর করে ধরে আনিনি সেটাই বললাম শুধু। একটু থেমে বলেছিল, এখন এখানে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো না বললেই কি নয় ?

মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল আক্রোশ তৈরী হচ্ছিল। মনে হচ্ছে আমাকে যেন ব্যবহার করা হয়েছে। আমুর কথাটাও পুরোপুরি মিথ্যে ছিল না। ও তো কোনদিন আমাকে ওর সঙ্গে আসতে বলেনি। আমিই বরং বলেছিলাম, এত দূরে দূরে একা যাও গানের অনুষ্ঠান থাকলে, ফিরতে রাত হয়। আমি থাকবো সঙ্গে।

আমু খিলখিল করে হেসেছিল বরং। আমি বুঝি একা চলতে ভয় পাই? রাত্রে আমার জন্য পাহারাদার লাগে?

তুমি ভয় পাও বলিনি তো। আমি ভয় পাই। কোথায় কখন কি হয়, চিন্তা হয়।

পুরো চোখ মেলে তাকিয়েছিল আমু। কিছুক্ষণ পলক পড়েনি। তারপর বলল, ভয় পাওয়াটা একটা অসুখ। আমার বাবা বলে। আমার সঙ্গে যাবি, আমার কিসের আপত্তি, কিন্তু বুকে ভয় নিয়ে যাস না।

সেই রাত্রে আমুর সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো মনে পড়ছিল, আর আমুর প্রতিটা কথা জুড়ে জুড়ে একটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব আবিষ্কার করছিলাম। আমি রেগে বলে উঠেছিলাম, এখন আমাকে আর পছন্দ হচ্ছে না, তাই গুটি কেটে বেরোতে চাইছ।

লার্ভার জন্য গুটি লাগে প্রতীপ, তবু সেও কেটে বেরিয়ে যায় একসময়। তখন কি করবি? সেই প্রজাপতিটাকে আবার গুটিতে আটকে রাখবি বুঝি? তারপর কিছুই হয়নি ভাব টেনে বলল, তুই থাকবি আরও, না বেরোবি?

যাও না, তোমার ওই সুব্রতবাবুর সঙ্গে চলে যাও। আমি পরে যাবো।

দেখি সুব্রতদা এখনো আছে কিনা, বারবার বলেছিল ওর গাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা। বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি আমু, কাঁধের ব্যাগটা সামনে টেনে, বেরিয়ে গেল আমাকে ওখানে বসিয়ে রেখে।

এই সুব্রতকে নিয়েই আসলে সেদিন আমাদের ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল। তার আগের গানের আসরেও দেখেছিলাম ওনাকে। অনেকটা বড় আমাদের থেকে। দুদিনই গানের পরে খুব হেসে হেসে কথা হচ্ছিল দুজনের। আমু বলেছিল, ওর নাকি অনেকদিনের চেনা।

ওকি তোমাকে ফলো করছে? আগের দিনও দেখলাম।

তখনো আমুর হাসিতে ক্লান্তি ছুঁতে পারেনি। দুলে দুলে হেসে উঠল, ঠিক ওই কথাটাই সুব্রতদা জিজ্ঞেস করছিল। এই প্রতীপ ছেলেটা কে? তোমার সঙ্গে রোজ দেখছি কেন? কাকে কি বলি বলতো?

আমার মাথাটা ঝন করে উঠেছিল। আমার মনের কথাগুলো সরলরেখা ধরে দৌড়াচ্ছিল। আমি আর এই সুব্রত কি এক? আমাকে যদি ও ভালই না বাসে, তাহলে আমাকে কেন এমন নাকে দড়ি ধরে ঘোরাচ্ছে? একটা হিংস্রতা আমার শরীরের অধিকার নিচ্ছিল। আমার হাত দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসছিল আমুর দুই কাঁধে।

(তুহিনা বলেছিল, না না আলোগুলো বুঁজিয়ে দে প্লিজ।

পট করে আলো নিভিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। বাইরে পৃথিবী জ্যোৎস্না আলোয় ভেসে যাচ্ছিল, জানালার ফাঁকফোকর গলে আসা আলোতে দেখলাম তুহিনা চোখ দুটো বুঁজে ফেলেছে লজ্জায়, আমি ঠোঁট ওর ঠোঁটের কাছে নাবাতেই ওর ডান হাতটা দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, জানালার পর্দাটা ভাল করে টেনে দাও, তারপর।

জানালার ভারি পর্দা টানতেই ঘরের মধ্যে মিশমিশে অন্ধকার। ফিরতেই তুহিনা আমার বুকে মাথা রেখে বলল, আমাকে ভালবাসো?

এক ঝটকায় ওকে কোলে তুলে নিয়েই মনে হল যেন একটা পালকের শরীর। ওর কাঁধে দুই একবার হাত রেখেছি, একবার কোমরে। কিন্তু কখনো এর বেশি কাছে আসতে দেয়নি এর আগে। সেদিন এক এক করে সব পোশাক খুলে আমার সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল তুহিনা। নিজে আমার মাথা ধরে টেনে নিল বুকের উপরে।

কতদিন এই সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু মনে আছে তুহিনাকে জড়িয়ে ধরে কিরকম বিপরীত একটা অনুভূতি হল। হঠাৎ। সেদিন।

কেন ?

সে কি এত সহজে ও আমার হয়ে গেল বলে ? আগে মনে হচ্ছিল আমি ওর পিছনে ঘুরছি, ও অলভ্য। সে রাতে হঠাৎ মনে হল যেন আমাকে পাওয়ার জন্য মেয়েটা নিজেকে বাজি রেখে ফেলেছে। এমনটাও মনে হল আমি যেন প্রথম নই, সুবীরদার সঙ্গেও এমন হয়ে থাকতে পারে।

আমি কি ভয় পেয়ে গেলাম যে এবার এই মেয়েটির সব দায়িত্ব আমার, শুধু ওর না হয়তো ওদের বাড়ীর সবার ? ওর মার বানানো মামলেটের কাঁচা সরষের তেলের গন্ধটা ধক করে নাকে এসে লাগল। আমার দুই হাতের মধ্যে ওর শরীরটা কেমন পলকা মনে হল, ওর পায়রার মত ছোট ছোট বুক, শীর্ণ বাহু যেদিকে এতদিন আমার চোখও যায়নি হঠাৎ কেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক ওই সময়ে আলাদা আলাদা করে এইসব ভেবেছিলাম না পরের কটা দিন এসব মাথায় ঘুরছিল, মনে নেই। কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তুহিনার ঠোঁট আমার ঠোঁটের মধ্যে নিয়েও আমার মনে একটা তুল্যমূল্য বিচার শুরু হয়ে গেছিল। আমি জানি সেরকম কিছু একটা হচ্ছিল, কারণ শরীর থেকে এক লহমায় সব কামনা উধাও হয়ে যেতোনা তা না হলে।)

সেদিনের পর আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমুর। বেশ কয়েকবার আমি ওর বাড়ি গেছি। কিন্তু ওর মার সঙ্গে কথা বলেই চলে আসতে হয়েছিল, আমুকে একদিনও বাড়িতে পেলাম না। ওর মা বলল, আগে থেকে ফোন করে এসো এরপর থেকে। তাহলে এরকম হেনস্থা হবে না।

(আমি তুহিনার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তুহিনা আমাকে চিঠি লিখেছিল, খামটা এতো ভারি ছিল যে খুলেও দেখিনি ভয়ে। একদিন হস্টেলে ঘরে শুয়ে আছি, আমার কাছে খবর এলো কেউ এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সিঁড়ি দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম তুহিনা বসে আছে আমাদের ওয়েটিং রুমের হাতলের রেক্সিন ছেঁড়া খয়েরী সোফাটায়। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, লম্বা হাতা ব্লাউজ। সিড়ির উপর থেকে আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু শরীর। তাও একটা অদ্ভুত অ্যাঙ্গেল থেকে। কি শীর্ণ লাগছিল ওকে। এরকমই ছিল, নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না বলে। আমি ভয়ে দৌড়ে আবার নিজের ঘরে চলে গেলাম। যে বন্ধু খবর নিয়ে এসেছিল ওকে আবার পাঠালাম খবর দিতে যে আমি হস্টেলে নেই। সুজন আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল, কি কেস গুরু ? কাটিয়ে দিচ্ছিস নাকি ?

আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি। আমার হস্টেলের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল এমনিতেই। চাকরি নিয়ে অন্য শহরে চলে গিয়েছিলাম দুমাস বাদেই। কিভাবে আমার ঠিকানা পেয়েছিল জানি না, আমাকে একটা নিউ ইয়ার্সগ্রীটিংস পাঠিয়েছিল আমার নতুন ঠিকানায়। তাতে শুধুই লেখা ছিল, নতুন বছরে নতুন জীবনে ভাল থাকিস।

আর কোনদিন কোন খবর নেয় নি, আমিও। অনেকদিন ধরে মনে একটা ভয় ছিল তপন আমাকে যদি চেপে ধরে, অ্যাই আমার দিদির সঙ্গে কি করেছিলি তুই ? মানুষের মন কি অদ্ভুত। বহু বছর পরে মনে হয়েছে সেরকম হলেই বুঝি ভাল হত।)

আমুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আবার হচ্ছিলও না। কেমন হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগোচ্ছিল। আমি বেশ কিছু কথা বলবো বলবো করেও আটকে যাচ্ছিলাম, আর আমু কিছু কথা বলবে না বলে হাসির মোড়ক পরাচ্ছিল। অনেকটা কবাডি খেলার

মত, চুঁ বলে ধাওয়া দিয়েছি কিন্তু কোর্টে একা হয়ে গেলে দুদিকেই একটা নিরাপদ দূরত্ব তৈরী করার প্রবণতা হয়। সেরকম। এই করতে করতেই সময় পেরিয়ে গেল।

আমুর ফ্লাইট আমার আগে, গেটের দিকে উঠে গেল। অনেক কথা হবে তোর সঙ্গে পরে, কি ভাল হলো বল তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ! ঝকঝকে হাসি ফুলের তোড়ার মত বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে।

আমু চলে যাওয়ার পরে খেয়াল করলাম, আমার বিজনেস কার্ডটা চেয়ারের পাশের ছোট টুলটায় ফেলে গেছে। এমা ভুলে গেল ? আমিই ওর নাম্বারটা চেয়েছিলাম। আমু বলেছিল, এই তো বিজনেস কার্ডে তোর নাম্বার আছে। আমি মিসড কল দিলেই আমার নাম্বারটা পেয়ে যাবি। কথায় কথায় ও মিসড কল দেয়নি, আমিও ভুলে গেছিলাম। এখন কি হবে ?

তখনই মনে পড়ল আমু একবারও জিজ্ঞেস করেনি আমার বাড়ি কোন শহরে। ও যাচ্ছে ডালাসে, কে জানে ওটাই ওর শহর কিনা। একবারও জানতে চায়নি আমার জীবনের কথা। অথচ যাওয়ার আগে কেমন ভাবে বলল –

আমুর ছেড়ে যাওয়া খোলস নিয়ে বসে রইলাম। আমার ফ্লাইটের ডাক আসা পর্যন্ত।

(তুহিনার সঙ্গে বিদায়টা একটু অন্যরকমের হয়েছিল। কিংবা একই। বাস্তব জীবন আর গল্পের জীবন তো হুবহু এক হয় না।

আমি ওর গানের স্কুলের সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে আসতে আবার ফিরে গেছিলাম। তখন তুহিনা আর একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, বোধহয় কোন ছাত্রীর মা। উফ, কথা যেন শেষই হয় না। মুখে সেই হাসি, যেমন অকাতরে বিলানোর অভ্যেস তুহিনার। আমি টগবগে ঘোড়ার মত অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম।

ওই ভদ্রমহিলা যেতেই তুহিনার সামনে হাজির হলাম। ওকে খুব অবাক হতে দেখলাম না। যেন আমি ফিরে আসব সেটা জানাই ছিল। দেখে আমি আরো রেগে ফেটে পড়লাম। তোমার কোন অনুযোগ নেই ? দুঃখ ? অন্তত রাগ করতে পারতে ?

খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তুহিনা। কেন ?

আমার সঙ্গে কি অভিনয় করছো তুমি ? কেন তুমি জানো না ?

খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল তুহিনা। সবার উপরে চাইলেও কি রাগ দেখানো যায় বল ?

ব্যাস এইটুকুই।

এইটুকুই শুধু।)

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী – হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন সাতটি শহরে এবং সতেরোটি বাড়িতে বিছিয়ে দেওয়া নিজের চল্লিশোর্ধ জীবনে অনেক গোল, চৌকো, সোজা এবং তেরচা গল্প জমে গেছে। অতএব লেখা শুরু হয়েছিল আট দশ বছর আগে। মুশকিল হল লিখতে গিয়ে আরও বেশি বেশি গল্প খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই লেখা চলছে জোরকদমে। সেইসব গল্পের কিছু নোঙ্গর বেঁধেছে 'যেবার পেলে এসেছিল' এবং 'বাবালি বাবালি বাবালি' গল্পগ্রন্থে। প্রথম উপন্যাস ছায়াপাখি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের মুখে। কিছু নাটকও লিখেছেন। দুটি অনূদিত নাটক রণাঙ্গন এবং ঘুঘুডাঙ্গা মঞ্চে প্রশংশিত। তার এখনকার শহর অ্যান আরবার, মিশিগান কিন্তু চেন্নাই এবং কলকাতায় টিকি বাঁধা আছে।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

মেজদার দোকান-১
সমরেশ বসুর দুনিয়া

শীতের সন্ধ্যে। কলকারখানা ঘেরা শহরতলী। মেজদার চা-ঘুগনির দোকানে আড্ডা বসেছে। আড্ডার আসল আকর্ষণ মেজদা নিজেই। ঢালাই কারখানার মিস্ত্রীর আর ট্রেড ইউনিয়নের জীবন কাটিয়েছেন। পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের ট্রাডিশনে, নেশা ছিল পাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর বই পড়া। কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে এখন চা-ঘুগনির দোকান।

আড্ডার মাঝে এক বন্ধু প্রফেসর বলছিলেন, 'এই বাঙলায় একসময় মহিলা টেক্সটাইল টেকনিশিয়ানদের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আনা হয়েছিল। বাঙালি মহিলা শ্রমিকদের ট্রেনিং দেবার জন্যে। জেনেট হেনরি কেইলম্যান বলে এক মহিলার স্মৃতিকথাতে আছে। সে অনেককাল আগে, ১৮২০ সালের লেখা।' অজানা দুষ্প্রাপ্য এক তথ্য।

মেজদা খদ্দেরের জন্যে টোস্টে মাখন চিনি লাগাচ্ছিলেন। মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলেন, "এটা কিন্তু সমরেশ বসুর 'জগদ্দলে' আছে। ওইসব ব্রিটিশ মেয়েদের কবর, হাওড়ার বাউড়িয়া কটন মিলে আছে। কেউ কেউ বাঙালি বিয়েও করেছিল।"

এইরকমই আর এক সন্ধ্যেতে কথা উঠেছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক নিয়ে। তাছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময় বাঙলায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে, সোশালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ডব্লকের সম্পর্ক কি ছিল ? এইসব। মানে এককথায় ৪০-৫০ এর ঝড়ঝাপটার দশকগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস। গবেষক-প্রফেসর বন্ধুরা থিওডর ড্রেপ, ভিক্টর কিয়েরম্যান, মিনু মাসানি, রজনী পাম দত্ত, ইত্যাদি লেখক বা নেতাদের লেখা/চিঠির উল্লেখ করছিলেন। মেজদা ঘুগনিতে নারকোল কুঁচো মেশাতে মশাতে বলেছিলেন, "ওসব লেখা এই আধা শহরে কোথায় পাবেন ? সমরেশ বসুর 'খন্ডিতা', 'যুগ যুগ জিয়ে' পড়ুন বেশ কিছু সূত্র পাবেন।"

সেই ধুলো ধোঁয়া মাখা সন্ধ্যেগুলো আমার মনে আছে। আর সেই নতুন করে সমরেশ পড়ার শুরু।

সমরেশ আমাদের খাঁটি রাজনৈতিক কর্মীসমাজের মাঝে টেনে এনে ফেলে দিয়েছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন কেমন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস আর রাজনৈতিক উপন্যাসের মাঝের কাঁটাতারের বেড়া আলগা করে দেওয়া যায়। আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলুম, বাঙলার বামপন্থী উপন্যাসের বাউন্ডারি তাঁর হাত ধরে অনেক বড়ো হয়ে গেছে। বামপন্থী, প্রগতিশীল গদ্যসাহিত্যর প্রধান জমি ছিল চাষীর লড়াই, শ্রমিক সংগঠন আর মধ্যবিত্তর পিছুটান। এইভাবে সার্থক ট্র্যাডিশন যখন তৈরি হয়েছে, তখন রাজনীতির অন্যদিক, মানে তার নেতৃত্ব, দ্বন্দ্ব, রাজনীতির ঘূর্ণী, অলি-গলির দরজাটা সমরেশ বসু খুলে দিয়েছিলেন। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামীদের খুনোখুনি, অন্ধগলির চোরাগোপ্তা রাজনীতি আমাদের সামনে চলে আসে। এককথায় চল্লিশের দশকের ধূলো মাখা ঝোড়ো হাওয়াকে নির্মম আয়নার মতো সমরেশ আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। এই দশক ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে উত্তাল, রক্তাক্ত পিরিয়ড আবার একই সঙ্গে অস্বস্তিকর অধ্যায়। কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এই যুগ এক বিতর্কিত পর্ব। উত্তরঙ্গ, জগদ্দল, শ্রীমতীকাফে, খন্ডিতা, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, যুগ যুজ জীয়ে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কাহিনির ঐতিহ্যের আকাশটাকে অনেক বড় করে দিয়েছিল।

চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির নীচুতলার মধ্যবিত্ত কর্মীদের কথা সমরেশ, পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এভাবে –

'... কাস্তে হাতুড়ি ছাপ দেওয়া বই হাতে হাতে আসত, যা তখন নিষিদ্ধ। সাধারণ কর্মীরা আগস্টে হঠাৎ স্ট্যালিন-

হিটলার চুক্তির খবরে বিভ্রান্ত। ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হতে শুরু হতে লাগল। তারপরে আবার হঠাৎ যখন কমিনটার্নের নীতি বদলে জনযুদ্ধের রাজনীতি এল, তখন আবার একটা ধাক্কার সামনে কমিউনিস্ট কর্মীরা পড়ে গেল। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি তখনো জনযুদ্ধের ডাক গ্রহণ করেনি। কমিন্টার্নের অফিসিয়াল নির্দেশ অনুযায়ী, তখনও ব্রিটিশ ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির যারা আজমীঢ় মারোয়াড় বা দেওলি জেলে ছিলেন তাঁদের কাছে (কমিন্টার্নের নির্দেশ, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মারফত ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে) জনযুদ্ধের আর ফ্যাসিস্টবিরোধী ফ্রন্টের চূড়ান্ত নির্দেশ পৌঁছে যায়। নীচুতলার কর্মীরা আবার উলটো বিভ্রান্তি তে পড়ে যায়।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ফেরার কর্মীরা, নিজেদেরই পার্টির নেতাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ (করেছিলেন) .... 'দে (লিডারস) আর ফলোয়িং দ্য ইম্পিরিয়ালিস্ট লাই'।

আমরা যখন প্রথম যুগ যুগ জিয়ে পড়ি এই অংশে এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। এটাকি পড়ছি ! সমরেশ এসব তথ্য পেলেন কোথা থেকে !

এই অংশের কিছু পরেই সেই সময়কার বাংলার শহরতলীর রাজনৈতিক পরিবেশ বোঝাতে একটা আড্ডার সামনে পাঠকদের নিয়ে আসেন – মুখোমুখি সবিতাব্রত পন্ডিত নামে এক উচ্চমধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট কর্মী আর দয়াল মিশির নামে চটকলের বিহারী লাইনের ছোট ব্যবসায়ীর আদর্শবান যুবক। বিহার মুল্লুকে কাজে গিয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে হঠাৎ ফিরে এসেছে।

'দয়াল মিশির বলে, "পালিয়ে এসেছি। আমার নামে হুলিয়া আছে। এখানে বিপ্লব শুরু করতে হবে। ওরা আমাদের গুলি করে মারছে, গ্রেপ্তার করছে। আমরা হরতালের ডাক দিচ্ছি, কাজ কারবার বন্ধ করে দিচ্ছি, রেল লাইন উপড়ে ফেলে ট্রান্সপোর্ট আটকে দিচ্ছি। সরকার আমাদের গয়েরকানুনি ডিকলিয়ার করেছে। কাগজে লিখেছে বোমের ভয়ে, ডকে ইউ.পি বিহারের মজুরের সংখ্যা কমে গেছে। রিকশা টানার লোকের অভাব। ভালোই হচ্ছে। সব কোলাপ্‌স হয়ে যাবে। ব্রিটিশরাজের লড়াই চলতে দেব না।'

পন্ডিতের দৃষ্টি কাগজের দিকে। কিন্তু ও কিছুই পড়ে না। মনে পড়ে যায় গত বারোই আগস্ট হ্যারি পলিটকে লেখা পি সি যোশীর চিঠির কথা, 'আওয়ার ফেলো পেট্রিয়টস হ্যাভ বিন প্রোভোকড টু দেয়ার প্রেজেন্ট সুইসাইডাল কোর্স বাই দ্য ইম্‌পিরিয়ালিস্ট রুলারস'। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায়, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে পাম দত্তের চার্চিলকে চিঠি।

দয়াল বলে, "(সবিতাব্রত পন্ডিতকে) কিন্তু আপনি কিছু বলছেন না।"

'তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।'

আর তার পরেই পুলিশ আসে দয়ালকে এ্যারেস্ট করতে। ধস্তাধস্তির মাঝে দয়াল এ্যারেস্ট হয়। সবিতাব্রত দয়ালকে মারার প্রতিবাদ করে। পুলিশের ছোটবাবু সবিতাব্রতকে ধমকে ওঠে। বড়বাবু চিনিতে পেরে বলেন, 'ওঁকে চেনেন না? আশ্চর্য! জনযুদ্ধওয়ালা। ওঁদের নিয়ে কোন ঝামেলা নেই।'

উপন্যাসের গোড়ার দিকে আবহাওয়া তৈরির পর্যায়ে এই পরিচ্ছেদগুলো এসেছে। আমরা সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মেজদার দোকানে অনেক রাত পর্যন্ত ছিলুম। কোন সময়কার ঘটনা সরাসরি বলা হচ্ছে না। যদিও বোঝা যায়, সময়টা ১৯৪২। সবিতাব্রতর সংলাপ বা পুলিশের 'জনযুদ্ধওলাদের' প্রতি প্রশ্রয়, মেঠো রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের অবস্থানকে তুলে আনছে। অপরদিকে ভারতছাড়ো আন্দোলনের কথা কলকাতার শহরতলীতে দিচ্ছেন না। যা হয়েছে তার বর্ণনা বিহারের, ইফপি এলাকার। দয়াল চরিত্র খবর হিসেবে দিচ্ছে। এইখানেই অসাধারণত। '৪২ এর আন্দোলন, সারা

বাঙলায়, মেদিনীপুর ছাড়া আর কোথাও তেমন সাড়া জাগানো ছাপ ফেলতে পারেনি। কিন্তু হিন্দী বলয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলেছিল। অন্তত একবছরের জন্যে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত নেতারা এ্যারেস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি জেলাস্তরে পর্যন্ত। তাই আন্দোলন যা হয়েছিল সোশ্যালিস্টরাই করেছিল। সমরেশ,পাঠককে ইতিহাস ধরিয়ে দিচ্ছেন। খুলে বলছেন না। এখানে সমরেশ একটা সুক্ষ্মসুতোর বুনন দিয়েছেন। বিহারের আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সমরেশ যে চরিত্রকে এনেছেন সে শুধু বিহারী নয়। সে উঁচু জাতের মানুষ, মিশির। আজকের সমাজতাত্ত্বিকরা খুঁজে বার করছেন যে ভারতছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মূলত উঁচুজাতের মানুষ। আবার যেন বুঝতে পারা গিয়েছিল কেন লোকে বলে সাহিত্য, সমাজের ছবি সমাজতাত্ত্বিকদের আগেই প্রতিফলিত করতে পারে। মাঝপথে এসেছে ১৯৪২ এর হিন্দুমহাসভা আর প্রজাকৃষক পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিত্বের কথা। ইতিহাসে যা শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা বলে পরিচিত।

উপন্যাসের শেষের দিকে আসে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের আক্রমণ। কমিউনিস্ট কর্মীদের মারতে মারতে নেতাজী জিন্দাবাদ বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা কোনমতেই রাজী হয়না। তাদের ময়লার ডাস্টবিনে ঢুকিয়ে দেয়।

প্রথমেই মনে আসে, কতজন সাধারণ পাঠক এই মারামারি, খুনোখুনির ইতিহাস জানে? কতজন কমিন্টার্নের কথা জানে? কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠন, কমিউইনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে যে ছোট করে কমিন্টার্ন বলা হোত। এ শব্দ, চলতি বাজারের পরিচিত শব্দ নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত দলিলের ফুটনোটে লেখা থাকত, 'সদস্য, ৩য় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক।' দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেকার সম্পর্কের খবর, আজকের সাধারণ মানুষের জানা সম্ভব নয়। আজকে কতজন পাঠক হ্যারি পলিটের নাম শুনেছে? রজনী পাম দত্তের সম্বন্ধে কতোজন ওয়াকিবহাল ? এমনকি পি সি যোশীর নাম সাধারণ পাঠক কি শুনেছে ? সে আমলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রর নাম ছিল 'জনযুদ্ধ'। এটাই বা কতজন মনে রেখেছে !

আরো একটা কথা সামনে আসে। এসব কি বাস্তব তথ্য, নাকি উপন্যাসের খাতিরে তৈরি তথ্য? যাকে তত্ত্বের ভাষায় বলে ইনভেনটিভ আর্কাইভ! ইনভেনটিভ আর্কাইভ কথাটা অনেক পরে উমবের্তো একোর নেম অফ দ্য রোস এর আলোচনার সময়ে পপুলার হয়েছে। কিন্তু সমরেশের মতো লেখক মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার দেশের বিতর্কিত রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে ইনভেনটিভ আর্কাইভ করবেননা! আশির দশকে সমরেশ যখন 'যুগ যুগ জিয়ে' লিখছেন তখনো কমিন্টার্নের বেশিরভাগ দলিল প্রকাশ পায়নি। সেসব দলিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নব্বইয়ের দশকে পপুলার হয়েছে। তখনো মাত্র দুটো বই পাওয়া যেত। থিওডর ড্রেপার (Theodore draper) এর দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ কমিন্টার্ন আর একটা মস্কোর পাব্লিকেশন – আউটলাইন ইতিহাস বা আউটলাইন হিস্ট্রি অফ কমিউনিস্ট ইন্টেরনাশন্যাল। ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাসের বইও বেশি পাওয়া যেত না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রেস স্টেটমেন্ট, ডকুমেন্টস বা দলিলের যেসব সংকলন সেইসময়ে বেরিয়েছিল তার মধ্যে ১৯৪০-৪৬ এর দলিলের সংকলন থাকত না। এসব ১৯৯৫ এর আগে বেরোয়নি।

উপন্যাসের গোড়ায় সবিতাব্রতর হাতে কাস্তে হাতুড়ি লাল পতাকা দেখে, পুকুরে স্নান করে উঠে আসা এক সৈন্য জিজ্ঞাসা করে 'তোমরা কমিউনিস্ট ? আমি ব্রিটেন থেকে এসেছি। আমি ফ্রেডরিক। আমিও কমিউনিস্ট। চতুর্দশবাহিনীতে আছি। আমি ভারতের কমিউনিস্টদের আন্দোলনের কথা শুনেছি, বেঞ্জমিন ফ্রান্সিস ব্র্যাডলির কাছ থেকে। ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে এসেছিল টুয়েন্টি ওয়ানে।'

সবিতা বলে 'কোন ব্র্যাডলি? ওই টুয়েন্টি সেভেনে পার্টির কাজে মিরাট কন্সপিরেসি কেসে যার জেল হয়েছিল? আরে আমার বয়স তখন চার।'

সেই তথ্যের বন্ধ্যা সময়ে সমরেশ, পাঠককে অচর্চিত ইতিহাসের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। মনে হয় পাঠকের কাছে

অনেক দাবি নিয়ে সমরেশ সামনে এসেছিলেন। এরকম উপন্যাস পড়তে গেলে হয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পাঠককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে,নয়ত এ উপন্যাস পড়তে পড়তে তাকে ইতিহাসের অন্তরের হাতছানিতে সাড়া দিতে হবে। এখানেই হলো সমরেশের দিগন্ত টপকানো স্পর্ধা।

উপন্যাসের মাঝে আসে চল্লিশের বাঙলা, তার মার্কিন সৈন্য ব্যারাক। না খেতে পাওয়া। বাঁচার জন্যে রাস্তায় নেমে আসা। চাল উধাও হয়ে যাওয়া। মন্বন্তর। যুদ্ধের হাত ধরে বেড়ে ওঠা হঠাৎ নবাব। আজকে আমরা কজন জানি কালোবাজারি শব্দটার জন্ম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ?

চটকল কারখানার একপাশে সেই সময় গড়ে উঠেছে মার্কিন সৈন্যদের ব্যারাক, রুজভেল্ট টাউন। সেইসব সৈন্যরা, যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেনে নারীমাংসের খোঁজে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে আসে। সমরেশ একের পর এক ক্যানভাস খুলে ধরেছেন।

অন্ধকারে ঝোপের ভেতর থেকে নগ্ন সোলজার চিৎকার করে 'হুস দেয়ার ?'

'ফ্রেন্ডস'

'হু দ্য ব্লাডি ফ্রেন্ডস ?'

'আইঅ্যাম স্যান্টোস দ্য ম্যান অফ কন্ট্রাকটর।'

'হেই স্যান্টোস, আই ওয়ান্ট জিগ জিগ।' একটা মেয়ের গলা শোনা যায়, 'নো সাহেব। হাম নেহি সেকেগা।'

সন্তোষ বলে, 'কেরে তুলসী নাকি।'

'আমি আসমান'। মানে হাসমাত চুনুরির বউ।

'ছুড়ি। মাল টেনেছিস মনে হচ্ছে ?'

'না টানলে চলবে কি করে। একে সাহেব, তায় বিষ্টি, শালাদের জন্যে মাথার ওপরে কিছু জোটেনি। ঘাসের ওপর রবাটের মতন কি পেতে নিয়েছে। দ্যাখোনা কিসব করছে। ঘেন্নাপিত্তি বলে কিছু নেই। আমাকে গিলে খাবে দেখছি।'

রসীদ বলে, 'হাসমতের না হয় কাল রোগে ধরেছে। কিন্তু হ্যাঁরে কমলা, তোর বর, পেঁচো দুলে তো গয়েসপুরে ধানজমি কিনেছিল? আউশ কাটার তো সময় এসে গেছে।'

'তা কাটছে। সে আর কতটুকু। ওই ধানে কদিন চলবে? এখনই তো একবেলা জোটে। আর এখানে রেতের বেলা করকরে নগদ টাকা। তোমরাও তো যা পাবে, পাবেই। আমাদেরটা একটু বেশি করিয়ে দিও।'

সন্তোষ-রশীদ, দালালির টাকা পায়। কথায় কথায় উঠতি ব্যবসার কথা উঠে আসে।

রশীদ বলে 'রুজভেল্ট টাউনের আর্মি মেসে বীরেনবাবু ডিম মাংস ভেজিটেবল, এ সব সাপ্লাই করে লাল হয়ে গেল। ভাবতে পারিস ছ পয়সা জোড়া ডিম কিনে চার আনায় বিক্রি করে।'

'সে কিরে !'

রসীদ সন্তোষকে বলে, 'তুই কি ভাবিস আমি জানিনা? তুই তো রোজ দেড়হাজার করে ডিম বীরেনবাবুকে সাপ্লাই দিস। ছ পয়সা দরে। চাষিদের থেকে পাঁচ পয়সা জোড়া দরে কিনিস।' তারপরেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ত্রিদিবেশের চোখের সামনে ভাসতে থাকে –

'চাঁদমারি, রুজভেল্ট টাউন-বিশাল অস্ত্রাগার, গ্যারিসন, প্রচুর ভেহিকেলস, বিমানবহর, সব অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে এবং খাদ্য রসদ । চার বছর আগে-এই জায়গা – এইখানে । ধোকড়দা গ্রাম ছিল ।এই মেয়েরা উৎখাত হয়ে গেছে ।'

খাদ্য রসদ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে নির্মম ভাবে চলে আসে মন্বন্তর । আড়তদার রামচন্দ্র আর কংগ্রেসি সমর্থক চন্দ্রনাথের মধ্যে কথা চলে –

'মড়ার গন্ধ পাচ্ছিলুম তাই দেখে এলুম । কার মড়ারে গজেন ?'

'দুলালের বউ – দুলাল আলি, চুনুরি, তার বউ ওটা । মনে লয়, বিষ ফল লতাপাতা কিছু খেইছিল মাগিটা, অনেকদিন ভাত জোটে নাই ।'

'মড়ার গন্ধ আসছে । নদীতে ফেলে দেবার ব্যবস্থা কর ।' তারপর চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি গন্ধ খুব বেশি পাচ্ছ ? মড়াটার ? দরজা বন্ধ করে দোব ?'

চন্দ্রনাথ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলেন, 'না না দরজা বন্ধ করবেন না । আসলে আমি কোন মড়ার গন্ধ পাচ্ছি না । শুধু চালের গন্ধই পাচ্ছি । দরজা বন্ধ করলে চালের গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে ।'

রামচন্দ্র হেসে উঠে বলেন, 'রাইট ইউ আর । চালের গন্ধ । এ হল সেই তিরিশ লক্ষ মন চালের তিন লক্ষ মনের গন্ধ । ঐ তোমার পেছনের গুদামে আছে । বুঝেছ তিনদিনে তিনটে জেলা থেকে তিরিশ লক্ষ মন চাল তুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ।'

'হ্যাঁ মনে হয় ফজলুল হক তিরিশ লক্ষ মন চালের কথা কোন এক মিটিং-এ ফাঁস করেছেন ।'

'ফাঁস ? হোয়াট ডু ইউ মিন ফাঁস ?' কমিউনিস্টরা যে শ্যামাপ্রসাদকে গালাগালি দেয়, ঠিক করে । উনি আর ফজলুল হক হাতে হাত ধরাধরি করে সস্তাদরে খাদ্যের দাবি করছেন । আর আজ তুমি ফজলুল হক, নিজেই স্বীকার করছ, তোমার সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টর শ'ওয়ালেস কোম্পানির হাতে তিরিশ লক্ষ চাল তুলে দিয়েছে । আর শ'ওয়ালেস তা তুলে দিয়েছে ক্লাইভ স্ট্রিটের সাহেবদের হাতে । এই যে গভর্নর জনহাব্রার্ট, মুসলিম লীগের ইস্পাহানীকে কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়েছেন চাল তোলার জন্যে । শ্যামাপ্রসাদ-ফজলুল হক কি করতে পেরেছেন?'

এরকম সময় চাকর গজেন এসে জানায় একটি বয়স্কা মহিলা একটি ছোট মেয়েকে বিক্রি করতে এসেছে ।

দুজনকে সামনে নিয়ে এসে গজেন বলে 'এবার বাবুকে বল ।'

'পঁচিশ ট্যাকা ।'

'এ্যাই মাগি রসুল দশ টাকা দর দিইছে না ।'

রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন 'হিঁদু না মুসলমান?'

'হিঁদু ।'

'হিঁদু মেয়েকে মোছলমান কি করে কিনবে ? কিনতে হলে হিঁদুই কিনবে ।'

বয়স্কা মহিলা বলে, 'বেশি চাই নাই বাবু ।' পেটে খেতে পেলে, তেলে জলে মাখাজোখা হলে, এই মেয়ে বাবু, দশটা মিনসের হ্যাপা পোয়াতে পারবে, বলে দিচ্ছি । ঘরেতে যা ছিল থালা ঘটি বাটি হাঁস মুরগী পায়রা ছাগল সব বেচা হয়ে গেছে । এখন ছেলেমেয়ে ছাড়া, বেচার কী আছে ?

চন্দ্রনাথের মনে পড়ে খবরে বেরিয়েছে চট্টগ্রাম আর নোয়াখালিতে দেড়-দু'টাকায় ছেলে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

মহিলাকে রামচন্দ্র তাড়িয়ে দেন। ছোট মেয়েটি বসে থাকে। তাকে কাঁচা চাল আর জল খেতে দেওয়া হয়। সমরেশের ভাষায় সে মেয়ের খাওয়া ফুটে ওঠে – 'হাত পেতে চাল নেয়, মুখে দিয়ে অতি দ্রুত চিবুতে গিয়ে যেন চোয়ালে শক্তি পায়না। সহসা দুই কষ বেয়ে লালা গড়াতে শুরু করে। ওর মুঠিতে চাল, মুখ একবারের জন্যও থামে না।, দুই কষবাহিত লালা ক্রমে চালগোলার মতো সাদা দেখায়। সুখানুভূতিতে ওর দুচোখ বুজে আসে। মুখ হাঁ করে মুঠির বাকি চাল গ্রাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, ঢোক গিলে চিবোতে থাকে।'

সে রাতে মেজদার দোকানে আমাদের অনেক রাত হয়েছিল। বৌদি বাধ্য হয়ে ভাত ডাল নিয়ে দোকানে চলে এসেছিলেন। রাত তখন প্রায় বারোটা। রাস্তা শুনশান। মেজদা ওপরের অংশটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। বৌদির চোখ ছিল শুকনো কিন্তু ভাত গলায় আটকে ছিল। গিলতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আমরা উঠে আসছি। মেজদা বলেছিল, 'খন্ডিতা আবার পড়ো। শারদীয়ার জন্যে ফরমায়েশি লেখা। কিন্তু সেখানে আছে দেশভাগের রাজনীতি আর হাত কেটে যাওয়া মানুষ।'

পরেরবার আমরা সেখান থেকেই শুরু করেছিলুম। আর বুঝতে চেয়েছিলুম, পয়সা রোজগার কেমন করে মহান সাহিত্যিককে ট্র্যাজেডিতে বেঁধে রাখে।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় – সত্তরের দশকে ছাত্রজীবন কাটিয়েছে। ওই দশকের ভালো খারাপ সবই তার মধ্যে আছে।বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকতে চায়। সাহিত্য,সামাজিক ইতিহাস-অর্থনীতির প্রবন্ধ আর ছোটগল্পের জগতে বিচরণ করতে চায়।

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

আব্দুল চাচার লড়াই

পর্ব ২

গল্পের সন্ধানে বারুইপুরে এসে পেলাম আব্দুল চাচাকে, তার মেধাবী মেয়ে আমিনার দুঃখের কথা শুনছি চাচার বাড়ির দাওয়ায় মাদুরে বসে চাচা বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে আছে, কি যেন ভাবছে। আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না, কি জানি কেঁচো খুঁড়তে কোন সাপ বেরোয় ? নিজেকে সামলে নিয়ে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে আব্দুলচাচা বলে – 'কিন্তু আসল গল্প তো এবার শুরু হবে দিদি, আমার আমিনার লড়াই-এর গল্প' – বলতে বলতে গলাটা ভেঙ্গে গেল চাচার ! আমি তাকালাম চাচারমুখে, দেখি গলার আওয়াজের সঙ্গে মুখটাও যেন ভেঙে-চুরে যাচ্ছে ! ভিতরের কোনো গভীর কষ্ট বার বার কাঁপিয়ে দিচ্ছে চাচাকে। মায়া হল, বললাম – 'থাকনা চাচা, তোমার কষ্ট হচ্ছে' – জোরে জোরে মাথা নাড়ে-'না দিদি আজ বলতে দাও, যত কষ্টই হোক ! 'আজ পর্যন্ত কাউরে বলি নাই, মেয়ের মা-রেও না ! কথা জমে জমে বুকটা পাথর হৈয়ে গেছে গো! মেয়েটা কাচে আছে, এখন এইটাই শান্তি কেবল' তারপর ঝেড়ে ফেলারমত করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে – 'না না, আগের কথা আগে ! বিয়ে মিটল মোটামুটি ভালোয় ভালোয়। কিন্তু আমার বুকের কাঁপন থামে না। কি যেন বিপদের ভয়ে সদাই ভয় করে' চাচা বলল মোটামুটি শান্তিতে কাটলো ক-মাস, অষ্টঙ্গলায় মেয়ে এসেছিল, খুব হাসি-খুশি মনে হয় নি তাদের, যেন ঠিক সুখী হয় নি ! তারা ভাবলো পড়ার অসুবিধা হয়, তাই হয়তো ! মাঝে অনেকদিন আসেনি আমিনা বাপের বাড়ি। বড় ঘরের বৌ, বার বার গরিব বাপের বাড়ি গেলে নাকি শ্বশুর বাড়ির মান যায়, অতএব

এবার এলো অনেকদিন পর, এসেই বলে – 'বাবা, এবার আমি পরীক্ষা দেব, তুমি তাদের বুঝাও' – তাতো দেবেই, তেমনি তো কথা হয়েছিল বিয়ের আগে ! একথার উত্তরে আমিনা কেঁদে ফেলে – 'সিটা হৈছিল, কিন্তু এখন তারা কথা ঘুরায় বাবা ! এমন কথা নাকি তারা দেয় নাই ! তুমার জামাই-ও মানে না' – কেন ? আব্দুল তো অবাক ! এইটা তো এমন কোন দাবি নয়, ভালো ছাত্রী, পড়তে ভালোবাসে, সেই জন্য পরীক্ষা দেবে, এইটুকু ! আর কথাও তো তেমনি হয়ে আছে, তাতে অরাজি হওয়ার কি আছে ? জল টলটল চোখে আমিনা বলে – 'তুমাদের জামাই বলে সে মাধ্যমিক, আর আমি উচ্চ মাধ্যমিক হইলে আমি নাকি তারে মানব না। লুকের কাছে সে নাকি মুখ দেখাতে পারবে না ! আমি বৈল্লাম তুমিও পরীক্ষা দাও ! সে বলে আমি সব ভুইলে গেছি। বৈল্লাম আমি পড়াবো, সে পাশ করবেই, গ্যারান্টি' – একটু থেমে, ইতস্তত করে বলেই ফেলে, 'সি-কতা শুনে আমায় কৈলে জুতায়ে মুখ ভেঙে দেবে, যত বড় মুখ নয়, ততবড় কতা ? আমারে পড়ায়ে তিনি বিদ্যেবতী নামকিনবেন ! বাবা, তুমাদের আমিনারে জুতায়ে মুখ ভাঙবে তুমার জামাই ! পড়তে চেইচি, কি দোষ কল্লাম বাবা ?' – হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে আমিনা। জীবনে সে একটা বকুনিও খায়নি, নাঘরে, না ইস্কুলে, না অন্যকোথাও-বাধ্য, সভ্য, সহবতের মেয়ে সে, তারে জুতা মারবে ? হতভম্ব হয়ে যায় মা-বাবা, কি বলে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না ! চাচা বলে – 'আমার বুকের সে কাঁপনটা আরো বেইড়ে গেল গো দিদি !' বিকালে ছেলেরা ফিরলে মিটিঙে বসা হল। বলেছিল বৌদের দরকার নাই, তা তারাকি মানা শোনে ? অনেক আলোচনা হল। সমাধান কিছু বেরোয় না, এমন সময় মেয়ের মামা এসে হাজীর ! আসলে আমিনার মা-ই লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে ডেকেছে। গুরুতর সমস্যা, আমিনা কিছুতেই আর শ্বশুর বাড়ি ফিরে যাবে না। দাদা-বৌদিদের মত যাওয়া উচিৎ, আর মা-বাবা তো হতভম্ব, স্তব্ধ ! কিছু ভাবতেই পারছে না, বলাতো দূরের কথা ! মামা বলল একেবারে প্রথমেই ঝগড়া-বিবাদে না গিয়ে, কথা বলে দেখা যাক না ! মামা নিজে গিয়ে তার শ্বশুরকে অনুরোধ করবে যাতে পরীক্ষাটা দিতে দেয় ! তারপর দেখা যাক কি হয় ! অনেক না না করেও আমিনা রাজি হয় ফিরে যেতে. নরম মেয়ে, বড় দের অবাধ্য হওয়ার মত মেয়ে নয় সে। চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গেল সে – 'বলব কি দিদি বুকটা ভেঙ্গে গেল আমার ! ছোট থেকে খুব শান্ত, বাধ্য মেয়ে, তাই মার বকুনি খায়নি সে, কাঁদেও নি তাই। আজ বিয়ে হয়ে সে মেয়ে আকুল কানছে দিদি, দেখা যায় নাগো !' – আমার সামনে বসে মেয়ের দুঃখে দুখী এক বৃদ্ধের আকুল কান্না

আমারও চোখে জল এনে দেয় ! চাচার পিঠে হাত রেখে সমবেদনা জানাই আর চোখ মুছি আমি ! বলার মত কোনো ভাষা খুঁজে পাইনা, সেই এক-ই গল্প ! যুগে যুগে মেয়েদের শক্তিকে খর্ব করে রাখার চেষ্টা ! কিন্তু এই গল্পটা যে গতানুগতিক গল্প থেকে আলাদা, সেটা বুঝতে পারি অনেক পরে!

আব্দুল চাচার আতিথ্য নিয়েছি সেই দুপুর বেলা, খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাওয়ায় পাতা মাদুরে বসে শুনছি আব্দুল চাচা আর তার মেয়ের লড়াই-এর গল্প ।দিন ঢলছে ধীরে, চাচার গল্প কখনো চলে, তারপর সেইসব দুঃখের কথা মনে করে মন ভারী হলে থামে কখনো । ভারী মনে চাচা আকাশ দ্যাখে, গামছা দিয়ে মুখ মুছে নেয়, সোজা গল্প তো নয় ! আদরের সন্তানের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা মন তো খারাপ হবেই ! কিন্তু একটু পরে নিজেই সামলে নেয় চাচা, তারপর আবার শুরু করে – 'তা সেবার তো কানতে কানতে-ই ঘরে গেল আমিনা' – বলেই হেসে ফেলে চাচা – 'ওই দ্যাক ঘর বলতেসি, কার ঘর দিদি ? কোন ঘর ? মেইয়ে লুকের যে নিজের ঘর থাকতে নাই গো, ভুলি যাই' – বড় বিষাদের সে হাসি ! ভাবলাম এই নিরক্ষর, সাধারণ চাষী যা বোঝে, অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোক সেটা বোঝে কি ? লেখাপড়া শেখেনি বটে, কিন্তু জীবনের শিক্ষা সে পেয়ে গেছে, দুঃখের ভিতর দিয়ে । চুপ করেই থাকি । আজ চাচাই বলবে, কথার বান ডেকেছে ওর মনে, মেয়েটার তার সঙ্গে নিজের দুঃখের কথা হয় তো এতদিন ভাগ করা হয় নি কারো সাথেই! চাচা আকাশ দ্যাখে, গাছপালা দ্যাখে, উড়ন্ত পাখি দ্যাখে । পাখিকে উড়তে দেখে তার আমিনার উড়বার সাধ আর বন্দী জীবনের কথাই ভাবে কি ? নিঃশ্বাস ফেলে গল্পে ফেরে আবার – 'তা সেই যে গ্যালো গ্যালোই । আর মেয়ের পাত্তা নাই । না একটা খবর, না কিছু ! চিন্তায় আমার পাগল হওয়ার জোগাড় ! শেষমেষ মেয়ের মামা গ্যালো একদিন তার শ্বশুর বাড়ি । খবর-ও নেবে, মেয়ের পড়ার কথাটাও বলবে, এই ইচ্ছা ! বার বার কৈয়ে দিলাম, খবরটা যেন দিয়ে তারপর বাড়ি যায়, তা কৈ ? তার সে খেয়াল আছে ? বুঝি সব ভুইল্যে নিজের বাড়ি চলে গ্যালো ! মনে মনে, তারে গাল পাড়তে লেগেছি, সে এইলো' – আবার দীর্ঘ নীরবতা ! বুঝলাম কোনো ভালো খবর আনতে পারেনি আমিনার মামা । কাজেই আব্দুল চাচার দুঃখের-ও অন্ত নাই ! কাকার ব্যাথায় সমব্যথী আমি চুপ করে বসে থাকি তার বাড়ির দাওয়ায়, আর আমার মহান দেশ ভারতবর্ষের, তথা বাংলার গ্রামে – ঘরে মেয়েদের অবস্থা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি । ইতিমধ্যে সামলে নেয় চাচা – 'ভাল খবর সে কি কইরে নেবে দিদি, আমার মেইয়েটা যে দুষি ! পইড়তে ক্যানে চায় সে ? বাংলাদেশের চাষী ঘরে জন্ম, তার আকাশের চান্দ ধইরবার সাধ ?' রাগে-দুঃখে-কান্না চাপার চেষ্টায় বিকৃত হয়ে যায় চাচার মুখটা । তারপর অতি কষ্টে আরো কিছু কথা বলে, কাঁদছেনা বটে আর, কিন্তু ভিতর থেকে একটা কান্না কাঁপুনি দিয়ে উঠছে কথার মাঝে মাঝে । বললো আমিনার মামাকে তারা নাকি খুব অপমান করেছে, সেটা বেশি কথা নয়, মেয়ের মামা তায় গরীব, তাচ্ছিল্য তাদের পাওনা, তার জানে । কথাটা আলাদা ! প্রথমে তারা আমিনা ভালো আছে বলে প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছিল, নাছোড়বান্দা মামা জেদ ধরায় দেখা করতে দেয় অবশেষে, কিন্তু বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়েকে চর হিসাবে সেই ঘরেই রাখে, যাতে মামা-ভাগ্নীর কি কথা হয় তারা জানতে পারে ! কিন্তু আমিনাকে দেখে তো মামা অবাক ! একি চেহারা সেই সুশ্রী দোহারা মেয়েটার ? আমিনা বলে এমনি একটু শরীর খারাপ । ওই বাচ্চা মেয়েটার সামনে বলবেই বা কি ? কিন্তু মামা তো আদরের ভাগ্নীর ব্যাপারটা না বুঝে যাবে না ! জল চাইবার ছুতো করে মেয়েটাকে বাইরে পাঠায়, তারপর নিভৃত কথায় জানতে পারে আমিনাকে জামাই মেরেছে এবং বাড়ির লোকের তাতে পুরো সায় আছে ! মেরেছে ? আমিনাকে ? যে মেয়েকে মারার মত কোনো দোষ তারা এত বছরে পায় নি, এরা এই ক'মাসেই ! দোষ আর কি ? ওই পড়ার জেদ! ওটা ছাড়তে হবে, তারা আর পড়াতে রাজী নয় ! আমিনাও পড়া ছাড়তে রাজী নয়, একটু রাগ করে বলেছিলো বুঝি তার বাবাই পড়ার খরচা দেবে! ব্যাস বাবুদের আঁতে ঘা ! এমন অপমান, তাই ছেলেকে দিয়ে মার খাইয়েছে সকলে মিলে ! একমাত্র জেঠতুতো বড় জা একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল, তা সেও তো এবাড়ির বৌ । তার-ই বা জোর কি ? আর কেউ কিছু বললো না ? এত বড় পরিবার, সব লোক একরকম ? তা বটে ! ওই ভাসুর-জা একটু অন্যরকম, তা তাদের কথা শুনছে কে ? ভাসুর খুব একটা রোজগার করে না, পরিবারের উপর নির্ভরশীল, তাদের কথা এরা শুনবে কেন ? সেই চিরকালের ক্ষমতার দম্ভ আর শক্তির অত্যাচার ! ট্রাডিশন চলেছে যুগযুগ ধরে ! বুঝলাম ঘটনা অনেক জটিল । যুগে যুগেই এইসব ঘটনা চলছেই এদেশে, এমনকি বিদেশেও ! হয় তো কারণটা আলাদা, কিন্তু অত্যাচারের কাহিনিটা প্রায় এক-ই!

বসে থাকি আর আকাশদেখি, আর আকাশ-পাতাল ভাবি!দিন ওদিকে প্রায় শেষের মুখে। সূর্য দেব পাটে বসেছেন অনেক্ষণ ! আমি উঠতেও পারছি না আমিনার কাহিনি ছেড়ে, ওদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে, বাস না বন্ধ হয়ে যায় ! ইতি মধ্যে চাচী এনেছে গরম চা আর পেঁয়াজ-লঙ্কাকুচি-তেল দিয়ে মাখা মুড়ি। চটকা ভাঙ্গে চাচার – 'তাই তো দিদি, রাত হয়ে যাচ্ছে, তুমি একরে একা বাড়ি যাবে, আইজ থাক। তা ছাড়া আমিনার-ও আসার সময় হল, এসব কথা শুনলে রাগ করে, বলে –' ইতিহাস ভুল হলে, নোংরা হলে তাকে ভুলতে হয় বাবা ! সেই দুঃখ আঁকড়ে বসে থাকলে চলে না। ভুলে গিয়ে, চোখ মুছে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। জীবন থামে না বাবা। সামনে এগিয়ে চলাই তার 'ধর্ম' – চমকে গেলাম, ছোট্ট একটা মেয়ে কত বড় কথা বলে ! মেয়েটা যে বিশেষ মানতে-ই হল মনে মনে ! বললাম – তা বেশ, কাল/পরশু আবার নয় আসব, আমার কি-ই বা কাজ ? এমন চাচা-চাচির সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগবে। তবে ভাত খাব না, খেয়ে-দেয়ে দেরী করে আসব। তোমরা খেয়ে নিও। চা-মুড়িতে মন দি, এমন সময় গেটের টিন ঠেলে ঢুকে আসে, আর কে ? সেই আমিনা। চাচা আলাপ করে দেয়, মুসলমান মেয়ে, কিন্তু আমাদের রীতি মেনেই প্রণাম করল আমাকে। আমি দেখলাম শ্যামলী কিন্তু সুশ্রী-সুঠাম, হাসিখুশি একজন তরুণী, জীবন ছন্দে আর মনের শক্তিতে ঝলমল করছে। ভিতরে গিয়ে, হাতের জিনিস রেখে এসে, কলতলায় মুখ-হাত-পা ধুয়ে, আমাদের পাশে বসে ! চাচী চা-মুড়ি দেয় তাকেও। খেতে খেতে গল্প চলে এঁা-সেটা, রাত ঘনায় ! চা-মুড়ি শেষ করে আমি উঠে পড়ি, আব্দুল চাচাও ওঠে, আমাকে স্টেশন-এ পৌঁছে দেবার দায় যে তার ! আবার আসব বলে বিদায় নি-ই, মা-মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ দেখা যায় ! আমার মনে হল খুব ভালোবাসার লোকের কাছে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে, তরতাজা হয়ে উঠলাম যেন ! তবু তার মধ্যেই আমিনার জন্য, আব্দুল চাচাদের জন্য একটা চাপা কষ্ট গুমোট হয়ে থাকলো মনে !

আব্দুল চাচাকে তো এত দিনে সকলেই চিনে গেছে ! কাল আমিনার কাহিনি শেষ হয় নি, তাই আজ সকাল হতেই তাড়াতাড়ি কাজকম্ম সেরে আবার ছুটে এসেছি প্রাণের টানে ! আমিনা, যে কিনা লেখাপড়া এত ভালোবাসে, তার কি লেখা পড়া বন্ধ হয়ে গেল ? সেটা হয়ে থাকলে তো আমিনার সঙ্গে সঙ্গে তার সংসার-সমাজ, আমাদের দেশের-ও ক্ষতি ! একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের মধ্যেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে অতি সহজে, যাতে দেশ ও দশের উপকার ! কি জানি কি হলো আমিনার লেখাপড়ার!মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন, অস্থিরতা ! চাচারা গ্রাম ছেড়ে কেন, কি ভাবে এই বারুইপুরে এলো, একজন মোটামুটি সম্পন্ন চাষী হয়েও এই বৃদ্ধ বয়সে চাচা কেন রিকশা চালায় ? শত প্রশ্নে জর্জরিত মন, কেমন যেন মনে হয় আমিনার জীবনের গল্পেই লুকিয়ে আছে এই সব প্রশ্নের উত্তর ! মনের সেই প্রশ্নের টানে আর এই প্রান্তিক মানুষগুলোর টানেই 'লেট লতিফ' আমার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে, তৈরী হয়ে হাঁচোড়-পাচোড় করে আজ দৌড়ে আসা ! চাচা-চাচী খাওয়া শেষ করার পরে, দাওয়ায় বসে চাচার গল্প শুনছি, আকাশ দেখছি, মেঘ আর পাখিদের পাল্লা দিয়ে ওড়াউড়ি দেখছি, গাছের হাওয়া খাচ্ছি, আর চাচার আমিনার কাহিনি শুনছি ! এই রিক্সাওয়ালা চাচার সঙ্গে কেমন যেন আত্মীয়তার বোধ হয়েছে মনের ।যেন নিজের লোক, যেন খুব আপন লোক ! আর আমিনা ? সেতো আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছে সেদিনের একটুখানি দেখায় ! শুধু কি দেখায় ? না, আব্দুল চাচার মুখে তার মেধাবী, তেজস্বী মেয়ের গল্প যা শুনেছি, আমি বিমোহিত হয়েছি ! একজন সাধারণ মুসলমান চাষী আর তার মেয়ে সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে লেখাপড়া করার দাবীতে, আমি বিস্মিত, আমি মুগ্ধ হয়েছি ! আমাদের এই ভারতবর্ষে তথা এই বাংলায় এমনিতেই মেয়েদের অবস্থা বেশ খারাপ, তারপর মুসলমানরা মানুক নামানুক, প্রকৃত সত্য হল, তাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ। লেখা পড়া শহরের মেয়েরা যদিবা কিছু শেখে, গ্রামে সেটা মোটেই নয় ! সুযোগ-ও কম। বেশিরভাগ গ্রামে পাঠশালার বেশিকিছু নেই। মুসলমান ধর্মের বিশেষ বিদ্যালয় মক্তব, মাদ্রাসা খুব কম গ্রামেই আছে। কিছুদূরে বর্ধিষ্ণু গ্রামে হয় তো আছে, কিন্তু পর্দা প্রথার জন্য দূরে মেয়েদের পড়তে যাওয়ার অনুমতি নেই ! সব মিলিয়ে মেয়েগুলোর পড়াটাই বরবাদ ! তাতে পরিবার বা সমাজের কোনো হেলদোল নেই। ছোট ছোট মেয়েগুলোকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে শান্তি ! তারপর সেই ছোট্ট মেয়ে হয় তো গিয়ে দেখবে তার বয়স্ক স্বামীর আগে দু/একবার বিয়ে হয়েছে, সেই বিবিরাও জীবিত ! তারা প্রথম থেকেই মেয়েটাকে শত্রুপক্ষ মনে করে বিরূপ ভাব পোষণ করতে থাকে ! অসহায় ছোট মেয়েটা সব অত্যাচার সইতে, নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত

থাকে, পড়াশোনার কথা ভাবার সময় পায় না!তারপর অপরিণত শরীরেই সন্তান আসে, নিজের শরীর নিয়ে আর সন্তান মানুষ করতে তার হিমশিম অবস্থা লেখাপড়ার কথা দূর দুরান্তেও মনে স্থান পায় না! মেয়ের বাবারাও অসহায়, ভাবে যে সমাজের যে দস্তুর ! সমাজের মাথাদের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব হয় না সাধারণ চাষী-মজুরের পক্ষে ! অতএব ঘরে ঘরে আমিনারা কষ্ট পায়, অসহায় মা-বাপ উপায়হীন দেখে যায় ! সেই রকম একটা কট্টর পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েও শিক্ষার জন্য আমিনার চমকপ্রদ লড়াই মনকে বিস্মিত করে!

চাচা বলে – 'গোলাপী রোজ ইসকুল ফেরত যায় আমিনার শোউর বাড়ি, ননদ-বৌ লেকাপড়া করে, দুজনের-ই লাভ। আমিনাটাও বন্ধুটারে পেইয়ে বেঁচে গেল দিদি ! ওর বাড়ির লোক পেরথমে একটু সন্দ করে কাছাকাছি ঘুরাঘুরি কৈরত, দাঁড়ায়ে থাইকত ! তা কদিন যেতেই ভাবে – 'এরা খালি পড়ার কতা কয়, সে আবার তাদের মাতায় ঢুকে না ! কতক্ষণ আর দাঁড়ায়ে থাকা যায় বল ? ঘরের নানা কাজ-কম্ম-ও তো থাকে' একটানা বলে থামে আব্দুল চাচা, মেয়ের যন্ত্রণার কথাই ভাবে বুঝি ! আমি নিজে তখন ভাবতে বসি ছবিটা কেমন হতে পারে ! আমিনা আর গোলাপী লেখাপড়া করে, পড়ার বিষয়ে কথা বলাবলিও করে। অঙ্কের কঠিন সমস্যা, ক্যালকুলাস, ইংরাজী, বিজ্ঞান কত রকম বিষয় ! সেসব এবাড়ির কেউ বোঝেও না, বিরক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে আর কেউ শোনে না পড়ার মাঝে এরা কি কথা বলে ! শুরু হয় এদের নিজস্ব কথা-বার্তা, মনের ভাবের আদান-প্রদান ! কথা যা হয় সেখানে, গোলাপি এসে আব্দুলকে বলে। সব কথার মোদ্দা কথা হল লেখাপড়া কিছুতেই ছাড়বে না আমিনা, তাতে যা হবার হোক ! বাপের বাড়ির সকলের কথায় একবার ভুল করে ফেলছে বিয়েকরে, আর সে ভুল করতে রাজি নয়, পড়া সে ছাড়বে না। আব্দুলের ভয় করতে শুরু করে ! ওবাড়ির লোকের কথা যত শুনছে, সে বুঝতে পারছে আমিনার পড়া-য় তাদের ঘোর আপত্তি ! আমিনা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেলে, সেই হবে ওবাড়ির সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া করা মানুষ, সেটা তারা হতে দেবেনা ! তাদের ছেলে-মেয়ে, নিদেন পক্ষে জামাই হলেও একটা কথা, কিন্তু ঘরের বৌ ? সে সকলের থেকে বেশি বিদ্বান, সেটা মানা যায় না ! বাংলা তথা পুরো ভারতবর্ষের কোথাও-ই এই ব্যাপারটাকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা নেই, এখনো তৈরী হয়নি ! কখনো হবে কিনা কে জানে ! একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে !

ইতি মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছে আব্দুল চাচা, না নিয়েই বা উপায়কি ? আমিনার এই জীবননাটক, না না, জীবনের মহাযুদ্ধে সেও তো একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ! আব্দুল চাচার কথায় বলি তারপরের কথা – 'গোলাপী রোজ তো খবর আনে না দিদি, বড় লোক আত্মীয়ের বাড়ি রোজ তো যাওয়া যায় না ! পড়া বোঝার ছলে সপ্তাহে দু/তিন দিন ! শনি/রবি তো মোটেই নয় ! আমার দিন কাটে না দিদি সদা ভয় ভয় ! বুকের ধুকপুকানি নিয়েই থাকি ! আইজ কাল আবার নতুন কিচু। গোলাপী অনেক কিচু কয় দিদি, কিন্তু আমার মন কয় সবটা কয় না ! জিগাইলেও এড়াইয়া যায় ! রাইতে ঘুম হয় না আমার, খুটখাট শব্দে জাইগা উইঠ্যা খালি মাইয়াটার কতাই ভাবি ! জানিনা বিয়া দিয়া কি সর্বনাশ ঘরে আইনলাম ! আমিনা আমার খুব নরম মেইয়ে দিদি, লড়াই তো তারে কুনদিন কইরতে হয় নাই ! কিন্তু লেকাপড়া খুব ভালবাসে, সিটায় বাধা পৈড়লে কিকরে কিজানি ! মেইয়ের কতা ভেইব্যে বুকের ভিতর কাঁপন লাগে, কাউরে কইতেও পারি না ! আমিনার মা-রেও না, সে ইসব বুজে না, শুদুমুদু ভয় পাবে, কি লাভ ? আর আমার ছেল্যেগুলা অপদার্থ, বৌয়ের ভেড়ুয়া তারা কান-ই দিবেনি ইসব কুথায় ! মনের কতাখান মনেই রেইখ্যে দেই, সে যে কি কষ্ট দিদি' – চোখ ছল ছল করে আসে চাচার ! আমি তার মুখে দেখি এক কন্যাস্নেহে অসহায় পিতার ছবি! মেয়ের সামান্য দাবী পূরণ না হওয়ার দুঃখ সে বোঝে। কিন্তু পরিবার বোঝে না, সমাজ বোঝে না মানুষ বোঝে না। দাবি কিছু অন্যায্য নয়, লেখাপড়া করতে চায় সে মেয়ে। আমরা সারাদিন গলা ফাটাচ্ছি সকলকে লেখাপড়া শেখানোর কথা বলে, 'সর্বশিক্ষাঅভিযান' করছি, 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' ঘরে ঘরে মেয়েদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া, সব হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মন না বদলালে এইসব-ই যে বৃথা সেই কথাটা বুঝি না ! এ কাজ তো একদিনে হবে না, অনেক সময়, অনেক ধৈর্য, অনেক যুগ লেগে যাবে। ততটা উদ্যোগ আমাদের নেই। প্রকৃত কাজ করার থেকে চায়ের কাপে আলোচনার তুফান তোলাটা বেশি প্রিয় আমাদের, সহজ-ও বটে ! আর একদল আছে সুযোগ সন্ধানী, সব প্রকল্প থেকেই কিছু লুটে নেওয়ার ধান্দা তাদের, কাজ করার নয়!কাজেই ঘরে ঘরে আমিনারা সামান্য লেখাপড়ার

আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যাকুল হয়, আর তাদের অতি সাধারণ, নিরক্ষর পিতারা মেয়েদের লড়াইয়ের কথা অনুধাবন করে, সঙ্গে থাকে,কষ্ট পায় ! এরা প্রান্তিক জনগণ, আমরা সত্যি খুব একটা মাথা ঘামাই না এদের নিয়ে। তার উপর আমিনা একজন মেয়ে, বাংলার গ্রামের সাধারণ মেয়ে ! আমার গল্প সেই সাধারণ মেয়েটার অসাধারণ লড়াই নিয়েই !

জানলাম প্রচন্ড জেদের লড়াই চলছে আমিনার শ্বশুর বাড়িতে, কিছুতেই তারা বৌকে পড়তে দেবে না। সুবিধা হয়েছে ছেলেটা তাদের দলে। নিজের থেকে বেশি পড়া বিদ্যেবতি বৌ তার চাই না। ফলে আমিনা একা, যেন শত্রুপুরীতে বাস ! রাঁধুনী মাসি খুব ভালোবাসে, তাই খাওয়াটা জোটে, নইলে – রাঁধুনী মাসি আসলে ভালোবেসে ফেলেছে মেয়েটাকে, এত শান্ত, ভালোমানুষ মেয়ে, সাত চড়ে রা করে না, তার সঙ্গে এদের খারাপ ব্যবহার করা তার পছন্দ হয় না। একদিন গোলাপী কে একা পেয়ে গজ গজ করে শোনাচ্ছিল – 'দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলের একলা বৌ, তা এদের ব্যাভারখানা দেকেচো ? কি চেইয়েছে ? না এট্টু পড়তে চায়। বইটাই যে মেয়েইয়েটার প্রাণ ! দামি কাপড়-গয়না হইলেয় কইতে পারতে ! এট্টু পড়তে ভালোবাসে বলে এত্ত হেনস্থা ভালো মেয়েটার ?' – কাজের মেয়েটাও তখন মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলো। তার-ও সমবেদনা দেখা গেল আমিনার জন্য। ওরা কি করে জানবে টাকা-গয়না বৌরা চাইলে বড়লোকরা খুশি হয়। সেটা বশংবদ হওয়ার লক্ষণ। শিকল পরা, পোষ মানার লক্ষণ ! কিন্তু পড়তে চাওয়া মানেই ডানা মেলার চেষ্টা, সেই ঔদ্ধ্যত্ব বড়লোকরা ভালো চোখে দ্যাখে না ! খাওদাও,সাজগোজ কর, দাঁড়ের পোষা পাখি হও, উড়বার সাধ কেন ? তাহলে তো বন্দী করতে হয়, তাহলে তো শেকল পরাতে হয়,তাতেও না মানলে ডানাদুটো ভাঙতে হয় ! সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে ! আব্দুল চাচার কথায় আমার ভাবনার জালটা ছেঁড়ে, চাচার মুখে চাই। চাচা বলে – 'দিদি গোলাপী আস্তে আস্তে সব জাইনছে, বুইঝছে, আমারে কয় না, ভাবে মন খারাপ হব্যে আমার ! মেইয়া সন্তানতো নরমমন, মনে মায়া-মমতা ! খুব বেশি জিগাইলে কয় এক সময় ! আর আমিনার কতাও ভাবি দিদি, ওই নরম মেইয়ে আমার, সে কিরম পাথর কঠিন হৈছে দ্যাকো ! কিছু ভয় নাই, কাউরে ডর নাই ! লেকাপড়া সে কইরবেই ! আমি তারে মান করি দিদি, আর ভয় করি ! কে জানে কি আছে আমার পড়াপাগল মেইয়েটার কপালে' – আমিও চাচার মতোই ভাবি, ভয় পাই ! সংসার-সমাজের অনুমোদন না পেলে পড়া করতে চাওয়া যে এখন-ও মেয়েদের বিরাট অপরাধ দেশে ! মেয়েরা নিজেরা ঠিক করবে নাকি পড়া করতে চায় কিনা ? পরিবারের ইচ্ছায় চলতে হবে, যে পরিবার চলে সমাজের ইচ্ছায় !গ্রামদেশে এখনো গ্রাম বুড়ো, পঞ্চায়েত, সালিশি সব আছে পুরো মাত্রায়, উপরে চিকন-চাকন,ভিতরে কিন্তু সেই খ্যার-ই গোঁজা,আমিনার বেলায় নিয়ম পাল্টে যাবে নাকি ? বাড়িসুদ্ধ লোক ধরেবেঁধে ষোলো/সতেরো বছরের মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিল, নামকা ওয়াস্তে একটা প্রতিশ্রুতি বিয়ের পরে পড়া চালাবার!হয় তো তারা জানতোই যে বিয়ে একবার হয়ে গেলে এই প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নাই ! সবটাই শ্বশুর বাড়ির মর্জির উপরে ! অথচ এটুকু মেয়ের বিয়ে আইনে আটকাবার কথা, হায় রে নিয়ম, হায়রে আইন ! কেই বা নালিশ করে, কেই বা বিচার পায় ? ওরা অনেকে জানেই না যে এমন আইন আছে, যদিবা খবর পায়, লোকাল থানার পুলিশ নালিশ নিতেই চায় না, ব্যবস্থা নেওয়া তো বহু দূরের কথা ! তাদের মতেও – 'বিয়ে দিয়ে দেওয়াই তো ভালো ! সোমত্ত মেয়ে ঘরে থাকলে, নিত্য ঝামেলার ভয়, তার'চে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো ! এইসবের মধ্যেও কিন্তু কিছু মেয়ে উঠে আসে, প্রতিবাদ করে, বিয়ে রোধ করে ! এখন গ্রামের দিকে খুব শোনা যায় মেয়েরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে স্কুলের মাষ্টার/দিদিমণিদের অথবা সরকারি কোনো অফিসারের সাহায্যে পুলিশ কে দিয়ে বিয়ে বন্ধ করায় ! তবে সে আর কটা ? বেশিরভাগ মেয়ে আমিনার মত, প্রতিবাদের স্বভাবটাই কম ! মানুষকে ওরা বিশ্বাস করে, ভালোবাসার আশায় পায়ে বেড়ি পরে ! ভাবি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তবু তো আমিনা তার মতো করে প্রতিবাদ করছে, লড়াই শুরু করেছে মানুষের সঙ্গে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে ! আমার মনে মুগ্ধতা দানা পাকিয়ে ওঠে, ভালো-মন্দ, আকাশপাতাল ভাবতে বসি !

আমাকে অবশ্য আমিনার থেকেও বেশি বিস্মিত করে আব্দুলচাচা ! মেয়ে তার আজকালের মেয়ে, যতটুকুই হোক কিছুটা অন্তত লেখাপড়া শিখেছে, স্কুলের দিদিমণি/মাষ্টার মশায়রাও জীবনে লেখাপড়ার উপকারিতা সম্মন্ধে বলেন, বোঝান ! কিন্তু আব্দুল চাচা নিজে নিরক্ষর এবং তেমন বড় চাষীও নয়। ভাগ চাষী নয় বটে, কিন্তু বড় জমির মালিক

জোতদার-ও নয় সে। কাজেই সমাজকে একটু ভয় করেই চলতে হয় তাকে।তার উপর মানুষটা বড় ভালমানুষ, শান্ত, নির্বিরোধী ধরণের ! তার পক্ষে মেয়ের লেখাপড়ার লড়াইয়ে সামিল হওয়াটা আমাকে খুব অবাক করেছে ! এধরনের লড়াইতে আমরাও সহজে যোগ দিতে চাই না, এড়িয়ে যাই – 'কি হবে, আমি তো কিছু বদলাতে পারব না' এই হল মনোভাব। সেখানে আব্দুল চাচা সত্যি বিস্ময় জাগায়। তার অনুভবে ধরা পড়েছে মেয়েদের লেখাপড়া করাটা দরকার, সেটাই আশ্চর্য !

(চলবে)

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

সুব্রত ঘোষ

অতলান্ত কথা

উষ্ণ লোমে (Lomé)

পর্ব ২

১

চতুর্দিকে শুধু নারকেল গাছের ভিড়। পায়ের নীচে পরিষ্কার সাদা বালির সমুদ্রতট। গরম হাওয়ার সঙ্গে এক অদ্ভুত ভেষজ গন্ধ ছড়িয়ে আছে। আমরা এখন লোমে শহরে। আর এই সমুদ্র সৈকত কোকো বীচ বলেই খ্যাত। আফ্রিকার তোগোল্যাস দেশের বড় আদরের এই সমুদ্র সৈকতটি। তাই অনেক অভাবেও এর যত্নের কোনো ত্রুটি হয় না। এখানে গাছের ছাওয়ায় কাঠের হেলান দেওয়া সুন্দর চেয়ার পাতা আছে। দু' গাছের মধ্যে ঝোলানো হয়েছে হ্যামক। আমি তা'তেই শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখছি। George এর লোমেতে আসবারই ছিল। এখানে এসেই ও সমুদ্রের জলের কাছে ছুটে গেছে। রীহা নামে একটি দুয়ালার মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ও আমাদের সঙ্গে এই কোকো বীচে এসেছে। রীহা ফরাসী ভাষার শিক্ষিকা। একটি প্রাণবন্ত যুবতী। ও লোমের একটা বিদ্যালয়ে পড়ায়। ওর বাবা, মা আর ভাইরা ক্যামেরুনে থাকে। দুয়ালাতে ও আমার ছবির Port folio দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিল।

দুলতে দুলতে দেখতে পাচ্ছি রীহা দু' গেলাস ডাবের সরবৎ নিয়ে আসছে। ওর মাথার চুলের বাহার দেখার মতো। টান টান কালো চাবুক চেহারাটা আরও উন্নত করে একটা গেলাস আমার দিকে তুলে ধরলো। মুখে এক অনাবিল সরল হাসি। ডাবের জলে কি সব যেন মিশিয়েছে, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মনে হোল যেন অমৃত পান করছি। বিদেশী পর্যটকদের কাছে এই সৈকত ভূমি যে স্বর্গ রূপে বিবেচিত হবে, এতে আর সন্দেহ কি।

এই পর্যটন শিল্পের ওপর তোগো রা অনেকটাই নির্ভরশীল। আটলান্টিকের উপকূলবর্তী এই সব দেশগুলোরই অন্যতম প্রধান উপার্জনের উপায় পর্যটন। এই তোগো দেশটি ও গাল্ফ অফ গিনীর অন্তর্গত, যার দক্ষিণে অপার আটলান্টিক। এর উত্তরে বুরকিনা ফাসো, পশ্চিমে ঘানা, আর পূর্বে বেনা। এই সব দেশ গুলো দীর্ঘবছর ঔপনিবেশিকতার কবলে থাকার পর ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে গাল্ফ অফ গিনীর এই দেশের মানুষদের দাসরূপে নিয়ে যাওয়া হতো ইওরোপের সব দেশে। একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই উপকূলের দেশগুলো দাস ব্যবসার জন্যে পাশ্চাত্য সমাজে সর্বাধিক আকাঙ্খিত কেন্দ্রস্থলে পরিগণিত হয়েছিল। ক্যামেরুন, ঘানা, তোগো, মালি, আইভরি কোস্ট, গিনী – এই সব আটলান্টিকের তীর সংলগ্ন দেশ থেকে জাহাজ বোঝাই করে দাস রপ্তানী হতো শ্বেতাঙ্গ লোকেদের সেবায়।

অথচ নিয়তির কি পরিহাস ! এই তোগো আর পাশের দেশ ঘানার মিলিত উপকূল ভূমিকেই ‘Gold Coast’ বলা হয় । তার কারণ, এই উপকূলেই সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর সোনার । সেই সোনার লোভে হিংস্র নেকড়ের মতো দলে দলে পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ দেশগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে এই উপকূলে । প্রথম কয়েক যুগ এখানকার মানুষেরা সোনার মূল্যই বুঝতো না । প্রাচীন কালে তো আয়নার বদলে ওরা সোনা দিয়ে দিত । সেই থেকে ক্রমে ক্রমে সব সোনা ইওরোপে চলে যায় । যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হলেও , Gold Coast এর এই স্বর্ণ ভান্ডারই ঐশ্বর্য্যশালী করে তোলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো দেশদের । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে এই তোগোভূমি জার্মানীর দখলে ছিল । তারপর সব ইওরোপীয়ানরা জার্মানীর যথেচ্ছ ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠলো । বিশেষত: ব্রিটিশদের একমাত্র লক্ষ্য হল জার্মানীর হাত থেকে যত কলোনী জায়গা আছে, সে সব ছিনিয়ে নেওয়া । জার্মানীর কাছ থেকে ব্রিটিশ ক্ষমতা নিয়েও নিল ১৯১৪ সালে । জার্মানীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো । আর দিকে দিকে ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে লাগলো । ক্ষমতা খানিকটা ভাগ হলো ফ্রান্সের সঙ্গে । এই তোগো ভূমিখন্ড ছিল অনেক বড় । এই ভূখন্ডের পশ্চিম থেকে পূর্বে যে প্রবাহমনা ভোল্টা নদী আটলান্টিকের শরীরে এসে মিলিত হয়েছে, সেই মিলন স্থানই Gold Coast, স্বর্ণ উপকূল । অনেকটা অংশ জুড়ে ফরাসী রাও আধিপত্য রেখেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে League of Nation ঘোষণা করলো যে, তোগোল্যান্ডের পূর্বভাগ ফ্রান্সের দখলে আর পশ্চিমভাগের মালিকানা রইলো ইংরেজদের । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আর ব্রিটিশ রা মিলে Territory Government বহাল করলো এই তোগোভূমিতে । Gold Coast পড়লো ব্রিটিশের আওতায় । দশ বছর পর ব্রিটিশদের অধিকৃত এই অংশকে তারা Dominion of the British Commonwealth দেশ হিসেবে মর্যাদা দিল । এর নতুন নাম হল ‘ঘানা’ । ঘানা স্বাধীন দেশে রুপান্তরিত হলো ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে । ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলটি ও স্বাধীনতা পেল ঐ বছরেই । এর নামকরণ হলো ‘তোগোল্যেস’, সংক্ষেপে ‘তোগো’ ।

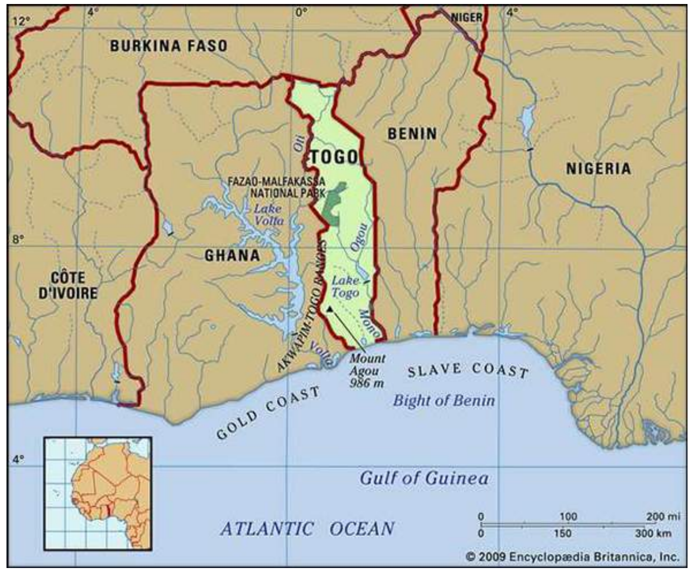

এই সব নিয়ে আমার সঙ্গে জর্জের দীর্ঘ আলোচনা হলো । জর্জের ধারণা ভারতবর্ষকেও প্রায় একই অবস্থায় পরতে হয়েছিলো ব্রিটিশ শাসনে । কিন্তু ভারতবাসীদের সাহেবরা কখনো ক্রীতদাস বানাতে পারে নি । ভারতবর্ষ অনেক অবক্ষয় আর অন্ধকারের মধ্যেও অনেক উন্নত মননের, চিন্তার মানুষদের দেখেছে ঐ দু’শ বছরে। আমাদের দেশের শিক্ষা, আভিজাত্য, আধ্যাত্মিকতা – এসব কিছু বিদেশী বণিকদের বিস্মিত করেছিল বৈকি । জর্জের কাছে এসব অজানা ছিল । “আমরা কি এখন Gold Coast এর আশে পাশেই আছি ?” কথাটা জিজ্ঞেস করতেই দেখলাম রীহা তার গলার সোনার হারটা হাত দিয়ে দেখিয়ে হাসছে ।

২

পরের দিন আমি আর George রীহার school দেখতে গেলাম । বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গার ওপরে একটা মিশনারিদের school । ওদের অফিসের একজন কর্মচারী আমাদের রীহার ক্লাসঘর টা দেখিয়ে দিল । আমরা লবি ধরে এগিয়ে যেতেই কয়েকটা ছোটো ছোটো বাচ্চা আমাদের দিকে এগিয়ে এল । খানিকটা এসেই থমকে গেল । বড় বড় সরল চোখে আমাদের দেখতে থাকলো । তারপরেই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে এক ছুট । এ যেন এক মধুর অভ্যর্থনা । ওদের হাসি মিলিয়ে যেতেই সামনের এক ঘর থেকে শিশুদের সমস্বরে কিছু আবৃত্তি আর তার সঙ্গে জোরে জোরে তাল ঠোকার

আওয়াজ শোনা গেল। সে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম রীহা ক্লাসে পড়াচ্ছে। ওর সামনে ছোটো ছোটো বাচ্চারা ঘুরে নাচছে। কালো মিষ্টি বাচ্চাগুলো তালে তালে হাত তালি দিয়ে একসঙ্গে সবাই কিছু বলছে। ভালো করে শোনার চেষ্টা করে বুঝলাম যে ওরা ফরাসী ব্যাকারণ শিখছে। দেখলাম রীহা একটা গোলাপী রঙের লম্বা ঘেরের বুবু পরেছে। অনেক বাচ্চাই ওদের মাপের বুবু পড়েছে। বুবু (Boubou) এখানকার নিজস্ব জাতীয় পোশাক। অনেকটা কাপ্তানের মতো দেখতে। এই আটলান্টিকের ধারে পশ্চিম আফ্রিকার সব দেশের জাতীয় পোশাক এটাই। যদিও পাশ্চাত্য পোশাক, আধুনিক জীন্স খুবই জনপ্রিয় এই কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে। রীহা তার বাঁ হাত দিয়ে বুবুর এক কোনা ধরে সামনে পেছনে দুলে দুলে বলছে, 'Je porte un grand boubou' বাচ্চারা সমস্বরে, 'Je porte un grand boubou' বলেই হাতে তালি দিয়ে এক পাক ঘুরে যাচ্ছে। কয়েকটি বাচ্চা তাদের সামনে কাঠের ডেস্কের ওপরে চাপড় দিয়ে তাল ঠুকছে। সেই তালে রীহা বলে চলেছে বাচ্চাদের জন্য, 'Nous porton les grand boubous'। সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হলো, 'Nous porton les grand boubous'। ক্রমে সবাই তালে একটা জোর দেওয়ার জন্য 'porte' কথাট দু'বার উচ্চারণ করতে লাগলো। বাঙলা করলে – 'আমি একটা বড় বুবু পরেছি .... তুমি একটা বড় বুবু পরেছো .... আমরা বড় বুবু পরেছি .... ইত্যাদি ....।' ওরা আসলে ফরাসী ভাষার 'ক্রিয়া' শিখছে, বিভিন্ন পুরুষে তার ধর্ম চিনছে। কি আনন্দ করেই না ওরা পড়া শিখছে। এ যেন এক performing art য়ের ক্লাস। George তো তা'ই মনে করেছিল। ও জিজ্ঞেস করলো, 'Is it a dance class?' পরে আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম। রীহার ক্লাসের rythm আর দেহ সঞ্চালন এই অঞ্চলের সব মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এই rythm এখানকার মানুষদের রক্তের মধ্যে প্রবাহীত। এই বিশ্বাস ক্রমেই আমার মধ্যে দৃঢ় হলো আরও যত দিন কাটতে লাগলো এই মহাসমুদ্রের তীরে।

আমরা তিন জনে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রীহার আজ স্কুলে half day। তাই ওর ছুটি। একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা ছুটলাম। উদ্দেশ্য প্রথমে lunch করা। খুব খিদে পেয়েছে। জর্জ অবশ্য মাঝ রাস্তায় নেমে গেল। ওর অন্যত্র যাওয়ার ছিল। শহরের ভেতরে একটা রেস্তোঁরা তে ট্যাক্সিটা দাঁড় করালো রীহা। রেস্তোঁরার উল্টো ফুটপাথের ওপরে দেখতে পেলাম মানু দিবাঙ্গোর একটা বিরাট cut out। ওর পুরো ছবিটা আফ্রিকার ম্যাপ জুরে রয়েছে। Air Africa-র advertisement। চারিদিকে সব bill board এই ফরাসীতে লেখা। আমি রীহাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানেও মানু popular?' রীহা জানাল যে, শুধু এ দেশেই নয়। মানু'র অসীম জনপ্রিয়তা পুরো আফ্রিকা জুড়ে। ইতিমধ্যে আমরা একটা টেবিল দখল করেছি। Waiter এসে মেনু কার্ড দিয়ে গেল। টেবিল সাজানো থেকে শুরু করে সমস্ত আদব কায়দা ফরাসী দেশের মতো। রীহা আমার কি খেতে ইচ্ছে তা' জিজ্ঞেস করলো। আমি ওর পছন্দের খাবারই খেতে চাইলাম। আমি তোগোদের খাবার বিষয়ে সত্যি অজ্ঞ। রীহার নির্বাচিত খাবার টেবিলে এল। অদ্ভুত দেখতে একটা মাছের পদ। আটলান্টিকের উপকূলে Gulf

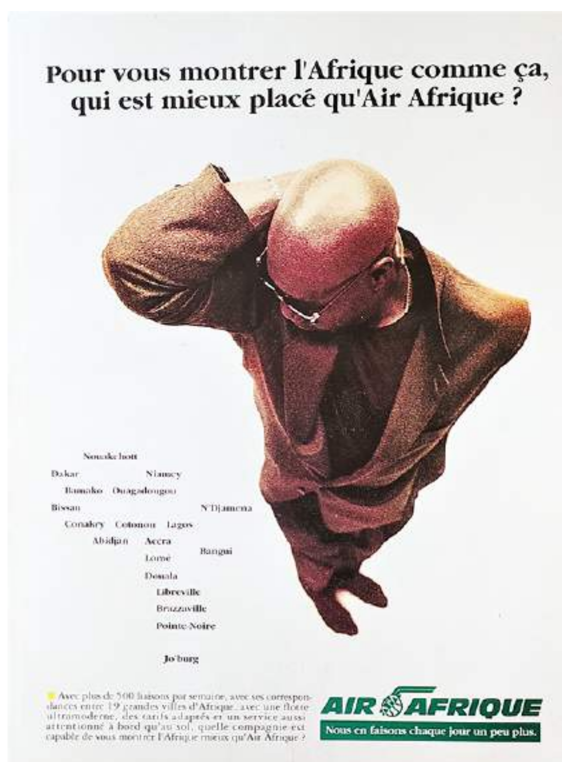

of Guinea অঞ্চলে মাছ স্বাভাবিক ভাবেই খুব জনপ্রিয় খাদ্য। মাছগুলো ভালো করে ভেজে একটা চিলি সসে ডোবানো। তা'তে অনেটা টোম্যাটো আর পালং শাক দেওয়া। কিন্তু খেতে আমাদের পরিচিত স্বাদের থেকে অনেক ভিন্ন। ভাতে ক্রিম মেশানো চিনে বাদাম দেওয়া। এই ভাতকে বলে Riz sauce d'archide । আর খেলাম ফুফু। এ সব এদের নিত্য খাবার। সঙ্গে ছিল ফরাসী বাগ্যেৎ, মানে লম্বা রুটি। আগে থেকেই ছোটো ঝুড়িতে রাখা ছিল। ফুফু এখানকার খুব প্রচলিত খাদ্য। মুলোর মতো একজাতীয় লম্বা ভান্ডার মুলকে রান্না করে এই খাবার তৈরী হয়। এই মুলকে রান্না করে নরম পাক দিয়ে একটা ময়দার মতো তাল বানানো হয়। দেখতে অনেকটা আমাদের ইডলির মতো। তারপর বাদাম পিষে একটা ঝোল বানানো হয়। এ দুইয়ের সমাহারই হলো ফুফু। বাদাম এদেশে প্রচুর পরিমানে হয়। এদের খাবারে বাদামের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখলেই তা' বোঝা যায়।

রেস্তোঁরা তে বেশ কিছু লোক খাবার খাচ্ছে। কিছু ফরাসীও আছে। তোগো বাজনা বাজছে। লম্বা চেহারার waiter টি এসে জানতে চাইল যে আর কিছু আমাদের লাগবে কি'না। "আমি কি এই অল্প সময়ে তোগোল্যেসের কিছু দেখতে পাব ?....." এই কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে ওর দিকে তাকালাম। রীহা মাথা নেড়ে জানালো, আর কিছু নেবে না। আমারও আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হলোনা। আমি চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে সামনে পা দু'টো এগিয়ে দিলাম। দু'পকেটে হাত দু'টো রেখে শরীটাকে একটু টান টান করলাম। একটা তৃপ্তি অনুভব করলাম। হঠাৎ রীহা আমাকে কি একটা ইশারা করে বলার চেষ্টা করলো। বুঝতে না পেরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে ওর দিকে তাকালাম। ও আমাকে বোঝাল যে, আমার দু' পকেটে হাত রেখে কথা বলা হয়তো আমার সম্পর্কে এখানে একটা খারাপ ধারণা তৈরী করবে। কারণ এ দেশে দু'পকেটে হাত রেখে কথা বলা কে অভদ্র আচরণ বলে গণ্য করা হয়। আমি তো অবাক। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই রীহা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলো, একটা দারুন জায়গায় যাব।" আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। রীহা ঠিক করেছে পায়ে হেঁটে এখন আমরা যাব। আমাকে ওকেই অনুসরণ করতে হবে। আমরা শহরের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো আমার জায়াগায় রবীন্দ্রনাথ থাকলে কি বলতেন, – "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী !"

রীহা অবশ্যই সুন্দরী। আর ভীষণ স্বপ্রতিভ। যেন মসৃণ কোনো কালো পাথরে গড়া একটা তীক্ষ্ণ চেহারা। টানা টানা চোখ আর লম্বা গ্রীবা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই রীহা এ হেন এই ভবঘুরে বাঙালী ছবি আঁকিয়ে কে নিয়ে লোমে শহরে হাঁটছে। রীহার সব কিছু এখানে পরিচিত। সরু রাস্তা আবার বড় আকার নিল। আমরা একটা বড় বাজারের মতো জায়গায় এসে পড়লাম। আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেছি। এখানে ভীষণ গরম। এ জায়াগাটা আসলে একটা বিরাট market place। রীহা দের ভাষায় 'Grande super marche'। এই সুপার মার্কেটটি ভীষণ জনপ্রিয় এখানে। মাইকে গান বাজছে। হকারদের চীৎকার। বহু জনসমাবেশে সমস্ত পরিবেশটা সরগরম। কত জামা কাপড়ের দোকান। তাদের সামনে রণপায়ে চড়ে বিচিত্র সাজে মুখোশ পরে কয়েকজন প্রায় নেচে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশে এখন বিপননে সাহায্য করতে এইরকম প্রদর্শন অবশ্য হয়ে থাকে। তবে আফ্রিকার এই অঞ্চলে এর চল বহু যুগ ধরে। ইতিমধ্যে রীহা এক জামার দোকানদারের সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলতে শুরু করলো। আমি ঝোলানো জামা গুলো দেখতে লাগলাম। বেশ কিছু জামায় বাটিকের design করা। চমৎকার লাগছে দেখতে। এই আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের দেশগুলোর boutique design এর খুব দীর্ঘ tradition। বড় বড় বুবু, পা জামা, টী শার্ট....সব হরেক রঙ্গীন পোশাকের মেলা। এই দৃষ্টি নন্দন বাজার ছেড়ে আবার হাঁটতে থাকলাম। পেছন থেকে কোনো এক হকার আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে এগিয়ে এলো, "Alors

mon amie....sil vous plait" । বিক্রেতা ছেলেটা ওর দু' হাতে ধরা অনেক গুলো কড়ি আর কাঠের মালা কিনতে অনুরোধ করছিল । আমরা ওর অনুরোধ না রেখে এগিয়ে গেলাম । রীহা অনেক কথা বলে চলছিল । জেনে অবাক হয়েছিলাম যে, ও HIV-AIDS এর সচেতনতার জন্য কাজ করে এমন একটা সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত । এখানে লোকেদের বিয়ের আগে ও পরে অনেক বাচ্চা হয় । ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যা এ দেশের সব অগ্রগতির অন্তরায় । তার ওপরে রয়েছে নানান রোগের বিস্তার । AIDS য়ের হার অনেক বেশী এখানে । এতকিছু কি করে সামলায় রীহা ? ওকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি । আর ওর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করছি ।

৩

আমরা অবশেষে রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসলাম । রীহার চেয়ে আমার নিজেকে বেশী ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল । এখানে যেমন বাজার দেখলাম, গড়িয়াহাট মনে পড়ে গেল । আমি রীহাকে কলকাতার গল্প করছিলাম । ও খুব সাগ্রহে শুনছিল । আর মাঝে মাঝে অনাবশ্যক ভাবে হাসছিল । এমন সময় একটি লোক একটা ঠেলা করে নারকেল নিয়ে যাচ্ছিল । ও আমাদের দিকে তাকাতেই রীহা ওকে হাত নেড়ে ডাকল । লোকটা কাছে এল । কিছু বলার আগেই একটা বড় মাটির পাত্র বের করে তার থেকে কি একটা তরল গ্লাসে ঢালতে শুরু করলো । রীহা লোকটাকে থামতে বলে কেমন এক দুষ্টু হাসি হাসলো । আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "Local drinks, চলবে ?" আমি বললাম, "বিষ নয় তো ?" রীহা হেসে উঠে জবাব দিল, "হতেও পারে" । পানীয়টির নাম 'সোদাবে' (Sodabe), তোগোদের খুব প্রিয় । রীহা এর উৎপত্তি, গুনাগুণ – এই সব বোঝাতে লাগলো । আমি যে কোনো দেশের খাবার, পানীয় সেই দেশের মাটিতে বসে উপভোগ করতে ভালবাসি । রীহা তাও সাবধান করলো, "এতে কিন্তু নেশা হয়, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ।" কোনো পরোয়া না করে হাত বাড়িয়ে দিলাম সোদাবের জন্য । লোকটা পানীয়টা তৈরী করে একটা নারকেল দু' ভাগ করে নারকেল মালার মধ্যে পানীয়টা আমাদের দিল । স্ট্র দিয়ে মুখে নিতেই একটা তীব্র অচেনা স্বাদ টের পেলাম । প্রথমটা যেন আমায় একটা ধাক্কা মারলো । তারপর আস্তে আস্তে ভালো লাগলো । নারকেলের গন্ধটা বেশ বুঝতে পারছি । জিজ্ঞেস করে জানলাম, শুধু নারকেলের জলই না । এর মধ্যে আরও অনেক রহস্য আছে । নারকেল গাছের গায়ের রসকে বেশ কিছুদিন মাটির পাত্রে রেখে জারিত করা হয় । সেই জারিত রসই এর মূল উপাদান । এই রসের সঙ্গে মেশানো হয় কাঁচা নারকেলের জল, যেটা চোখের সামনে একটু আগেই দেখলাম । আর অল্প আদার রস এবং soda water যোগ করে অদ্ভুত এক তাজা অনুভূতি আনা হয় এই তরলে । তাল গাছের রস হলে হয়তো 'তাড়ি' বলা হত । একে বাঙলায় কি বলত জানি না । রীহা অবশ্য বলল যে, আমাদের এই সরবতে অ্যালকহোলের মাত্রা নিমিত্ত মাত্র । রীহা এই পানীয় নিয়ে অনেক কথা বলল । এই সোদাবে তোগোদের সব উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় । সেখানে অবশ্য অ্যালকহোলের মাত্রা অনেক বেশী থাকে । রাস্তায় ফেরীওয়ালারা tourist দের পানীয় কে অনেক হাল্কা করে তৈরী করে । কিন্তু আকোদেস্সাওয়া (Akodessawa) র রাস্তায় ঢুকলে চরম নেশার সোদাবে না সেবন করে নিস্তার নেই । আকোদেস্সাওয়া তেই রয়েছে সর্ববৃহৎ 'ভুডু' বাজার । এই 'ভুডূ' চর্চা এ অঞ্চলে সুপ্রাচীন । ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, বেনা, তোগো আর ঘানার কিছু অংশে এই আদিম ধর্মীয় রীতির উৎপত্তি । ঐ ভুডু বাজার গেলে দেখা যায় সার দিয়ে রাখা বিভিন্ন পশুর মৃতদেহের ভিড় । কুমীরের দেহ, শেয়ালের খুলি, হায়নার পা, খুলি, ... কি নেই । বিক্রি হয় ভুডূ ঠাকুর, পুতুলও বলা যায় । এই ঠাকুরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ইওরোবা । এই

© WOLFGANG KAEHLER/AGEFOTOSTOCK
ZM4-2102453 - agefotostock

ঠাকুরদের উপাসনা করা হয় ঐ মৃত পশুদের দেহাংশ দিয়ে। এক এক পশুর মৃত আত্মাদের থেকে এক এক রকমের শক্তি অর্জন করা হয়। উপাসনা করেন পূজারী। এই বিশেষ বাজারে পূজারীরও খোঁজ মেলে। কোন পুজোয় কোন জন্তুর কোন শরীরের অংশ লাগবে তা' অভিজ্ঞ পুরুত ঠাকুরই ঠিক করে দেন। কালের যাত্রায় ক্যাথলিক ধর্মের কিছু প্রভাব এর ওপরে পরে। ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ চাপে এই অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষ খ্রিষ্টান ধর্মীয়। প্রায় ৩৭% মানুষ এখনো এই ভুডূ চর্চা করে। নানান দেশের লোক এই Fetish market টি দেখতে ছুটে আসে।

আমার ঐ বাজারে যাওয়ার ব্যাপারে রীহা প্রবল আপত্তি করলো। সে আপত্তি ওর ক্যাথলিক সত্তা থেকে এল কি না জানি না। তবে এ কথা তো সত্যি যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণবশত: এই আদিম উপজাতিদের আর উপনিবেশের প্রভুদের ধর্ম বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই উপকূলের ক্রীতদাসদের মাধ্যমেই 'ভুডূ' ক্যারেবিয়ান দ্বীপমালায়, আমেরিকার ল্যুইসিয়ানায়, ইওরোপের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। এই Voodooism নীগ্রো দলিত দাসদের একমাত্র শক্তির সম্বল হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ঠানরা কালো দাসদের এই ধর্ম চর্চাকে 'কালো যাদু' বা হানিকর বিদ্যা বলে প্রচার করে এসেছে। আমরাও সেই প্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি নি। কিন্তু তোগোদের এই ভুডূ চর্চা কোনো ক্ষতিকারক কাজে উৎসর্গীকৃত হয় না। এই উপাসনায় শুধু শক্তিকে আবাহন করা হয়। দুর্বলকে যেন 'ভুডূ' শক্তি যোগান, এই কামনাই করা হয়। আর ঐ পশুদেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ তৈরী হয়। বহু দরিদ্র আফ্রিকাবাসী ঐ ওষুধের ওপর নির্ভর করে। অতীতে আমাদের দেশ, চীন বা আরও অনেক প্রাচীন দেশে পশু-পাখির দেহাংশ দিয়ে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরী খুব অপরিচিত নয়। আবার এও সত্য, ভারতবর্ষ শল্য চিকিৎসা আর অস্ত্রপ্রচারের মতো আধুনিক চিকিৎসা বহু যুগ আগেই আবিষ্কার করেছিল ..... যখন ঐ উপনিবেশ প্রভুরা 'ভুডূ' র মতোই কিছু চর্চা করে দিন অতিবাহিত করতো।

রীহা ভুডূ চর্চা সমর্থন করে না। যদিও এই সব উপজাতিদের প্রতি ও যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। একটি ভুডূ পরিবারের একটি শিশুকে ও ভুডূ পুরোহিতদের হাত থেকে মুক্ত করে। শিশুটির শরীরে কিছু পবিত্র ভুডূ চিহ্ন খুঁজে পাওয়ায় প্রথা অনুযায়ী শিশুটিকে তার চার বছর বয়সে ভুডূ পুরোহিতদর হাতে চিরদিনের মতো তুলে দেওয়া হয়। পুরোহিতরা এই সব শিশুদের সংগ্রহ করে আগামী প্রজন্মের ভুডূ উপাসক তৈরী করে। ঐ ছেলেটির যখন ছয় বছর বয়স তখন রীহা তার সতীর্থদের নিয়ে তাকে প্রায় চুরি করে নিয়ে আসে। তাকে এখন এক বান্ধবীর কাছে রেখে বড় করছে। তার পড়াশোনার সব দায়িত্ব রীহা নিজে নিয়েছে। তবুও রীহার আক্ষেপ যে, ও একটি মাত্র ছেলেরই দায়িত্ব নিতে পেরেছে। আরও কত ছেলের জীবন অশিক্ষার অন্ধকারে এই ভুডূর মায়া জগতে শেষ হয়ে যায়।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে রীহাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরবো ঠিক করলাম। ট্যাক্সি একটা ধরেও ফেললাম। অনেক অনেক মাইল ছুটছে ট্যাক্সি। সূর্য্য তখন পাটে। তোগো লেকের গা বেয়ে আমরা ফিরছি। এই বিলটি এত বড় যে তার ওপার দেখা যায় না। এই বিশাল জলভূমির সঙ্গে কয়েকটি তন্বী সুন্দরী নদী যুক্ত হয়েছে। যেমন একটু পরেই দেখতে পেলাম সিও নদীর এক শাখাকে। রীহাই চিনিয়ে দিচ্ছিল। এ সমস্ত জলরাশি অনেকটা পথ ঘুরে মিশেছে সাগরে। সাগর পার থেকে একটা অদ্ভুত উষ্ণ বাতাস কোন এক অজানা সময়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেঘের ভেতরে ডুবতে ডুবতে সূর্য্যের সোনালি ছটা ছিটকে ছিটকে পড়ছে। আমার পাশে রীহাকে সেই সোনালি ছটায় কি আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। এক অপূর্ব মানবিক রূপ তার। এ রূপ এসেছে তার দয়া, মমতা আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে। খুব অবাক লাগছিল ভেবে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী

অত্যাচারিত হতে হতে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এত বিশ্বাস, এত ভালবাসা, এত খুশী বেঁচে থাকতে পারে এ দেশে ! রীহাকে না দেখলে জানতেই পারতাম না ।

*In a simple country homestead, passions simmer in the same manner as in a 'civilized' manor with all its comfort. We then realize that passion is not the sole prerogative of a given race that has reached a degree of civilization. To blossom, passion needs only the heart of man (Felix Couchoro, L'Esclave, 1929, p.23).

ফেলিক্স কূশোরো (Felix Couchoro) তোগোল্যেসের বিখ্যাত মনীষী যার লেখার মধ্য দিয়ে এদেশের জনমানসের চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে । তাঁর L'Esclave (Slave) বই টি শুধু তোগো দেশেই নয়, যথেষ্ট প্রভাব ফেলে খোদ ফরাসী দেশেও । ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার স্টোয়ের লেখা 'Uncle Tom's Cabin' এরপর প্রায় একই শক্তিতে ১৯২৯ এ কূশোরোর এই লেখা সাদা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাদের অমানুষ বৃত্তিকে দেখিয়ে দেয় । কালো সমাজ তাদের অধিকার আর মর্যাদা রক্ষার প্রতি সরব হতে থাকে । পশ্চিম উপকূলে ফরাসী উপনিবেশগুলোয় L'Esclave য়ের প্রভাব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ।

"তুমি নিশ্চয়ই কূশোরো পড়েছো, তাই না রীহা ?" – জিজ্ঞেস করতেই মুখের থেকে চুল সরাতে সরাতে ও উত্তর দিল – "কূশোরো আমার ঈশ্বর" । এদিকে রীহার গন্তব্য স্থান এসে গেল । নদীটা শেষের মুখে । এখান থেকে বাঁদিক ঘুরে এগোলেই আটলান্টিকের তীর । আমাকে ঐ দিক দিয়েই ফিরতে হবে । এখানে বাঁ দিকে নদী, ডান দিকে শহরের রাস্তা । রীহা নেমে দাঁড়াল । আমিও নামলাম । যেন একটা মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা । তারপর রীহা এগিয়ে এসে আমাকে ফরাসী কায়দায় বিদায় চুম্বনের ছোঁয়া দিল । মুহূর্তের জন্য মনে হল রীহার এই স্পর্শে শুধুই ভদ্রতা নয় । এক আত্মিক আবেদনও অনুভব করলাম । চলে যেতে যেতে আমাকে বলল, "তুমি খুব ভাল মানুষ । এরকমই থেকো, বদলে যেও না" ।

ট্যাক্সি ছুটল সমুদ্র তীরের দিকে । মনে মনে বললাম, – "রীহা, আমি বোধহয় তোমার মত অত ভাল নই । সমাজের আমি কি উপকারে লাগি ! তুমি ভাল থেকো । তোমার মতো আরও রীহা যেন এ দেশে জন্মায় ।"

রীহার সঙ্গে আমার আর কখনো যোগাযোগ হয় নি । জানতেও পারি নি, ও কেমন আছে । একটা ছোট্ট বালির কণার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায় । এতগুলো বছর পরেও রীহাকে নিয়ে মনের মণিকোঠায় সেই একটুকরো সোনালি স্মৃতি আজও উজ্জ্বল রয়েছে ।

Subrata Ghosh (MFA , M S University, Baroda, BVA , Govt. College of Arts & Crafts- 1st class 1st and B.A., Calcutta University) is a contemporary practising visual artist who loves to explore various media and disciplines through his practice. Subrata has achieved many national and international recognitions including a research scholarship from UNESCO - ASCHEBERG, Paris, a fellowship in Vermont Studio Centre, USA and the best painter of the year from the Bengal Chamber of Commerce. He was invited as a guest faculty in Savana College of Art & Design, Georgia, USA. He had his exhibitions in many places in India as well as in France, The Netherlands, The US and Singapore. Subrata also has contributed his essays on art in many Art journals and he also presents his lectures in many prestigious institutions. As an art educator Subrata works as HOD of Faculty of Art & Design, Calcutta International School. He was also a visiting faculty in the B. E. College, Howrah in the Dept. of Architecture and Township Planning. He is also active as the secretary of the legendary artists group 'Calcutta Painters'.

পারিজাত ব্যানার্জী

পাঠ প্রতিক্রিয়া

সিডনি থেকে লিখেছেন পারিজাত ব্যানার্জী –

বাতায়ন সংকলন বইটি মোটামুটি কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়লাম। বারবার যদিও তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকাটাই মন কেড়ে নিচ্ছিল একেবারে। তার সাথের কথাকটা – "যুক্তির ইমারত পেরিয়ে আমার মুক্তির বাতায়ন !" এমন শুরু যার সেই বই থেকে আশা তো বেড়ে যাওয়ারই কথা গুণাতীত ! তাই না !

হলও তাই। শুরু করলাম শ্রীজাতদার সম্পাদকীয় দিয়ে। মাটির মানুষ যিনি তিনিই বোধহয় পারেন এমন মনের কথা লিখতে। তাঁকে সামনাসামনি দেখে যেমন চিনেছিলাম এক বইমেলার সন্ধ্যায়; আবারও সেই উদ্যমী কিন্তু বিনয়ী মানুষ টিকেই খুঁজে পেলাম তাঁর লেখায়।

রঞ্জিতাদির কথা নতুন করে আর কিই বা বলতে পারি। যাঁরা চেনেন ওঁকে, পড়েছেন ওনার লেখা তাঁরা আমার মতোই জানিনা বারবার চমকে ওঠেন কিনা তাঁর চর্চার ব্যাপ্তির গভীরে ঝাঁপ দিয়ে ! সত্যিই দিদি, বড় ভাবাও তুমি .... তবে তা নেহাতই কথার ছলে; ভাষা নিয়ে চর্চা কেই কাজে লাগিয়ে !

টানা একবছরেরও বেশি সময় ধরে বাতায়নের চলার পথের সঙ্গী আমরাও। মানসদার সাথে সেই পথচলার স্মৃতি গন্ধ গায়ে মেখে আবারও টের পেলাম; প্রবাসে সংস্কৃতি কে ধরে রাখতে ঠিক পথই অন্তত পেরেছি বেছে নিতে আমরাও অবশেষে।

অনুশ্রীদির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফসল যে বাতায়ন তাকে শারদীয় সাজে সাজিয়ে তোলার গল্পখানি সত্যিই বড় সাবলীল। আর নানা গুণীজনের চোখে আরেকবার শ্রীজাতদাকে তাঁর লেখার মাধ্যমে ছুঁতে পারাটা বাতায়নের যে সবচেয়ে বড় পাওনা তা বলাই বাহুল্য।

এরপর বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, অন্য স্বাদের লেখা, গল্প পড়লাম। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি লেখার এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সূর্যমুখীর বাগান', 'রবিবার' বা 'অরণ্যের কবি স্বরাজ মিত্র' এক স্বাভাবিক ছন্দে লেখনীকে শান দিয়ে চলা অনন্য গাথা।

মানসদার 'চন্দনের বনে', যশোধরা রায়চৌধুরীর 'বুদবুদের কবিতা' ও 'ভালো ও খারাপ'; সঞ্জয়দা'র 'সুর হারানোর দিন', রুবাইয়া জেসমিনের 'বাড়ি' বা 'জরতী', পিনাকী গুহর 'জ্যোৎস্নাছোঁয়া বারান্দায়' রবিরশ্মিদার 'হারিয়ে যাওয়া আমি', তাপস কুমার রায়ের 'সুন্দর কাকুর জীবন' বাদবাকি সমস্ত কবিতাদের মতোই সংগ্রহ রাখার মতো সব ভিন্ন ঘরানার বার্তাবাহক।

তন্ময় চক্রবর্তী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জিতাদির প্রবন্ধ অনেক অনন্য অচেনাকে এক কথায় বোধহয় স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই, চেনার দোরগোড়ায় এনে নিঃসন্দেহে দাঁড় করায়।

অন্য স্বাদের লেখায় ত্রিদিববাবুর 'কোঁকোঁর কোঁ' রম্যরচনার এক অন্য স্বাদই ধরে এনে দিলেন তাঁর সহজাত ছন্দে।

শাশ্বতী গুহঠাকুরতা'র 'দূরে কোথায়'; চুমকি চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টেপলার', সুজয় দত্তর 'নষ্ট' ও 'প্রয়োজন', রমা জোয়ারদারের 'বাইরে তখন বরফ পড়ছে', ইন্দ্রাণী দত্তের 'অরফ্যানগঞ্জ', তপনজ্যোতি মিত্রের 'করুণার মত ঘরবাড়ি', মল্লিকা ধরের 'ছায়াবর্ণালি' বা অর্পিতা চ্যাটার্জি র 'সই' – প্রত্যেক টি গল্পই পাঠককে ভাবায় তাদের নিজস্ব ছন্দে ।

সমকালীন রচনায় বাদবাকিদের পাশাপাশি শাশ্বতী বসুর 'এক টুকরো কেক ও করোনা' অবশ্যই দাগ রেখে যায় মনের নিভৃতে ।

ভ্রমণে অমৃতা মুখার্জি র 'নারীর ভূষণ' বা অঞ্জন রায়ের 'পিতার ভবনে' বেশ ব্যতিক্রমী ধারা তো বটেই ।

এতকিছুর পরেও পড়া বাকি থেকে গেল বেশ কিছু গল্প, মুক্তগদ্য, কবিতা, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও নাটক ।

এরপরেও ভাবছেন মণিমুক্তো কিনবেন গয়না গড়তে ? তাও বলুন, সত্যিই কি হয় ?

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায় । বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক । ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই । এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায় । বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে ।

শাশ্বতী বসু

পাঠান্ত ভাবনা

মহাভারতের ছয় প্রবীণ
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

আনন্দ পাবলিশার্স
মূল্য: ৩০০

"মহাভারতের ছয় প্রবীণ" পড়লাম। এটি নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী 'মহাভারত' সিরিজের আর একটি উজ্জ্বল রত্ন । সংস্কৃত ঘেঁষা তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারে রচিত এই বইটি একবার পড়তে শুরু করলে ছেড়ে উঠে আসা আয়াসসাধ্য। অসাধারণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নির্বাচিত করা মহাভারত আশ্রিত চরিত্রসূত্রগুলির সাহায্যে তিনি এই ছটি প্রবীন চরিত্রের ছবি এঁকেছেন । ব্যাসদেবের মত প্রসারিত মানব হৃদয় ও মানবিক মন খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি একই পরম স্নেহে তিল তিল করে দুর্জন, খল ও পরম সজ্জন কে গড়ে তুলেছেন। এইজন্যেই মহাভারত মহাকাব্য। পড়া শেষ করে মনে হল মহাভারতকে আবার যেন নতুন করে জানলাম।

জানা গেলো মহাভারতের প্রধান কাহিনির পাশাপাশি অজস্র উপকাহিনি রয়েছে – যাদের মূল উদ্দেশ্য হোল প্রধান কাহিনি বা চরিত্রগুলির ক্রিয়া কর্মকে সমর্থন করা বা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা । অনেকটা আমাদের যে কোন অ্যাপ্লিকেশান এর সাপোর্টিং ডকুমেন্টস এর মত।

এই ছটি চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই এসেছেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। যিনি মহাভারত কথাকার। এটাই পরম আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি স্বয়ং নিজেরই চরিত্র অঙ্কন করেছেন মহাভারতে। মহামুনি ব্রাহ্মণ পিতা পরাশর আর শুদ্রানী মাতা সত্যবতীর নৌকাবক্ষে মুহূর্ত ক্ষণের ভাসমান মিলনের ফল আমাদের ব্যাসদেব। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরীর বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে জন্মসূত্রে পাওয়া এই শুদ্রাংশ ভাগটি ব্যাসদেব কখনও ভুলে যান নি। ভুলে যান নি তার মাতা সত্যবতীর ধীবর পরিবারে পালিত হবার কাহিনীটি। অনুভব করেছেন শূদ্রা ধীবরজননীর সমাজ-ভয়-ভীত কম্প্র শোনিতবিন্দু গুলিও। তাই তিনি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন।

তারপর একে একে এসেছেন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র ও পরিশেষে বিদুর। এঁরা সবাই পারিবারিক আত্মীয়তায় সম্পর্কিত। ব্যাসদেব হচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এর পিতা। পুত্র ব্যাসদেবকে মাতা সত্যবতী (যিনি কুরুরাজ শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন এই প্রতিশ্রুতিতে যে তাঁর ছেলে ভবিষ্যতে হস্তিনাপুরের রাজা হবে – গঙ্গাদেবী ও শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম নন) নিয়োজিত করেছিলেন বিচিত্রবীর্যের বিধবা অপুত্রক পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভাধান সৃজনে, কুরুবংশ রক্ষা করার খাতিরে। জন্মেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ঠিক সেরকমভাবেই বিদুরের নিয়জিত পিতা ব্যাসদেবও। মাতা অবশ্য এক্ষেত্রে পুত্রবধূ অম্বিকা নন – অম্বিকা তাঁর দাসিকে পাঠিয়েছিলেন ব্যাসের কাছে সত্যবতীর অজান্তে। জন্মেছিলেন বিদুর। সুতরাং বিদুরের মাতা এক তাঁর শুদ্রানী দাসী। ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এর পিতৃব্য বা কাকা হচ্ছেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম – যিনি সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের বৈমাত্রেয় ভাই । তাঁদের তিনজনের পিতাই শান্তনু। ব্যাসদেবও বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের বৈমাত্রেয় ভাই – তাঁদের তিনজনের মাতাই সত্যবতী। কৃপাচার্য ছিলেন রাজা শান্তনুর পালিত পুত্র। তিনি তাঁকে আর তার বোনকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন আপন সন্তান সম হস্তিনাপুর রাজপুত্রের মত। এই দুই ভাইবোন শান্তনুর কৃপায় প্রতিপালিত হয়েছিল। তাই ভাইবোনের নাম হয়েছিল যথাক্রমে কৃপ ও কৃপি। কৃপ অস্ত্রশাস্ত্রে নৈপুণ্য অর্জন করে হয়েছিলেন কুরুবংশের

রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু। তাঁর বোন কৃপি কে বিবাহ করেছিলেন দ্রোণ, এবং পরে তিনিই কৌরব পাণ্ডব পুত্রদের অস্ত্রগুরু হয়েছিলেন কৃপাচার্যর স্থানে। কৃপাচার্য সেটাই চেয়েছিলেন। দ্রোণের অস্ত্র নৈপুণ্য কৃপকে অতিক্রম করেছিলো।

যদিও লেখক মহাভারতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চরিত্রসুক্ত বা শ্লোকগুলোর আশ্রয়ই নিয়েছেন এই প্রবীণদের চরিত্র বিশ্লেষণে তবুও বইটিতে চরিত্রের ব্যাখ্যা তার নিজস্ব মনন ও প্রজ্ঞায় আলোকিত। তিনি বলেছেন – কাউকে যদি "মহাভারতের চরিত্র সমালোচনা করতে হয় তবে মহাভারতের কবির প্রসারিত হৃদয়ের অনুবর্তী হয়েই তা করতে হবে। কারণ ভারতবর্ষের মনন, দর্শন এবং ভাবনা দিয়ে তিনি যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা উপস্কার-পরিস্কারের মাধ্যমে ভাঙ্গা-গড়া করা যায়, কিন্তু সে চরিত্রের মূল আলোকপাতটুকু অতিক্রম করা যায় না, করা উচিতও নয়"। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সেটা করেন নি। উপরন্তু বলেছেন 'নিজের পছন্দ অপছন্দের উর্ধে উঠে একমাত্র প্রেমিক হৃদয় দিয়েই মহাভারতের চরিত্রগুলোকে অনুভব করা যায়' – তিনি তাই করেছেন। যে ক্রমপর্যায়ে চরিত্রগুলো পর পর এসেছে তা নৃসিংহপ্রসাদের নিজস্ব ভাবনা। কি কারণে প্রথমে ব্যাসদেব এলেন – মহাভারতের কথাকার হিসেবে হয়ত তার স্থান তালিকার শীর্ষে – কিন্তু কি কারণে ভীষ্ম আগে এসেছেন তারপরে দ্রোণাচার্য এবং মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র এবং সবচেয়ে শেষে বিদুর তার কোন কারণ দেখান নি লেখক। মনে হয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠতম যে সেই এসেছেন আগে। কিন্তু দেখছি বিদুরের চরিত্র আসাধারণ – এক কথায় শ্রেষ্ঠতম – তিনি বিদুরকে রেখেছেন সব শেষে।

ভীষ্মের চরিত্র অত্যন্ত আকর্ষক। তিনি রাজা শান্তনু এবং নদীনায়িকা গঙ্গার পুত্র। তিনি পিতার বিবাহ দিয়েছেন, পুত্রপ্রতিম বিচিত্রবীর্যের জন্য কন্যাহরণ করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন – শরীরে তো বটেই মনেও। একান্ত নির্মোহে আজীবন কুরুবংশের অভিভাবক হয়ে সে বংশের রক্ষা কর্তা হয়ে থেকেছেন। লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি এই কঠিন চরিত্রটিরও মনুষ্যোচিত দুর্বলতার কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন মহাবীর বলে তার অহঙ্কার ছিল। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি কাল ক্ষয় করেন নি কোন দিন। না হলে ভাইদের জন্য কেউ অমন ভাবে কন্যা হরণ করে না। তিনি নিজেকে ভাবতেন ভরত বংশের প্রথম, প্রধান ও শ্রেষ্ঠ গুরু বা দলপতি।

তার আর এক অহঙ্কার ছিল যে তিনি মনেও ব্রহ্মচারী। কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদের কলমে বিশেষ করে অম্বার সম্পর্কে ভীষ্মের মনোভাব এক আসাধারণ মানবিক ব্যাখ্যা। এক নিটোল প্রেমিক মন এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে অতলস্পর্শী জ্ঞান না থাকলে এ বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব নয়।

পাঠিকা হিসেবে আমার মনে হয় ধৃতরাষ্ট্র সবচাইতে বর্ণময় চরিত্র। তিনি ব্যাস নিয়োজিত অম্বিকা পুত্র। তিনি জন্মান্ধ। কারণ ব্যাখ্যাকারের মতে ব্যাসদেব সুশ্রী ছিলেন না। তার তপোদীপ্ত আগুনের মত উজ্জ্বল তীব্র চোখ, পিঙ্গল জটাভার, কালো অচর্চিত দেহ, বিকৃত গাত্র গন্ধে অম্বিকা ভয়ে অনীহায় চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেন তার মায়ের দোষে। তিনি দুর্যোধনের মতই কুটিল, লোভী ও স্বার্থপর । দুর্যোধন যা চিৎকার করে বলতেন – ধৃতরাষ্ট্র তাই বলতেন, কিন্তু ছলনা ভরে। তিনি অভিনয় পটু ছিলেন। নিজের লোভ আর পাণ্ডব-ঈর্ষা তিনি ঢেকে রাখতে পারতেন নিপুণ কৌশলে। প্রতিপদে ধৃতরাষ্ট্র তার এই ঘৃণ্য স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নৃসিংহপ্রসাদ তার জয় গান গেয়েছেন তার একটি মাত্র বৈশিষ্টের এর জন্য – সেটি তার অন্ধ পুত্র প্রেম।

কিন্তু পাঠকের মনে সন্দেহ হতেই পারে যে ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্ধ পুত্রস্নেহটিও খাঁটি নয় – নয় শর্তহীন। তিনি দুর্যোধন এর স্নেহে অন্ধ ছিলেন, এই জন্য যে তিনি যা বলতে চান কিন্তু বলতে পারেন না সেটা অন্যায় বলে, দুর্যোধন সেই কথা গুলোই অক্লেশে নির্লজ্জ ভাবে বলতে পারত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতার কারণে বা সম্পূর্ণ ভাগ্য দোষে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও রাজা হতে পারেন নি – এই দুরাপনেয় ক্ষোভ তার মনে নিত্য প্রজ্বলিত ছিল। তিনি নিজেকে বঞ্চিত ভাবতেন। এই হতাশা তার মনে এক ক্রুদ্ধ ক্রুর আক্রশের জন্ম দিয়েছিল। তিনি কোনদিনও তাই পাণ্ডুপুত্রদের সহ্য করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছেন পাণ্ডুপুত্ররা তার পদতলে পড়ে থাকুক চিরকাল। পাণ্ডবরা রাজ্য পেলে সেটা নাও হতে পারে। তাই তিনি তাদের ষড়যন্ত্র করে পুড়িয়ে মারতে, তাদের কৌশলে পাশা খেলিয়ে রাজ্য কেড়ে নিতে, তাদের বনে পাঠাতে কোন দ্বিধা করেন নি। আর এসব হয়েছে দুর্যোধনের বুদ্ধিতে। ধৃতরাষ্ট্র বাঁধা দেন নি। কারণ এগুলোই তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন। তার

নিত্য প্রজ্বলিত বঞ্চনার আগুন তাতে কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা তার নিজ প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই দেখি – পুত্রস্নেহ নয়। সর্বাগ্রে তিনি নিজে – তারপর তার পুত্রস্নেহ।

তারপর আরও দেখি যে দুর্যোধন মারা গেল – যুদ্ধ শেষ। গঙ্গায় তাদের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করে শোকে যখন যুধিষ্ঠির জ্ঞান হারালেন তখন ধৃতরাষ্ট্র শক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির কে সান্ত্বনা দিলেন। কারণ পঞ্চ পাণ্ডব ততক্ষণে, বিশেষ করে রাজা যুধিষ্ঠির এই পারলৌকিক ক্রিয়ার আগেই পিতামহ ধৃতরাষ্ট্রর কাছে এসেছিলেন এই প্রার্থনা নিয়ে যে তিনি যেন এই রাজ্য শাসন করেন, পঞ্চ পাণ্ডব তার চরণতলে বসে তিনি যা বলবেন তাই করবেন। তথাস্তু, ধৃতরাষ্ট্র রাজী হোলেন। ধৃতরাষ্ট্র তো এই চেয়েছেন সারা জীবন। এই ব্যবস্থা তার এতো মনপুতঃ হয়েছিল যে দুর্যোধন – যে তার এতো প্রিয়, যার স্নেহে যিনি অন্ধ ছিলেন তার মৃত্যুর পরও তিনি সংসার বৈরাগ্যতে অভিভূত হন নি। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশী তিনি রাজকীয় বিলাস ব্যসনে জীবন কাটিয়েছেন। এবং তার নিজের কথায় – এতো সুখ নাকি তিনি দুর্যোধনের জীবৎকালেও পান নি। তাই স্বভাবতই আমাদের মনে তার 'পুত্রস্নেহে অন্ধ' এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু লেখক নৃসিংহপ্রসাদ বলেছেন যে – মহাভারত কথাকার যে প্রেমে যে গভীরতায় ভীষ্ম – বিদুরের মত চরিত্র একেছিলেন সেই একী গভীরতায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন কে এঁকেছেন। এঁরা পৃথক কিন্তু স্বতোবিশিষ্ট – খল, কিন্তু সেই খলতায় খাঁটি, গভীর। এখানেই ব্যাসদেব বিশিষ্ট।

এরপর পর পর এসেছেন দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য ।

বইটির প্রবীণ চরিত্রদের শেষ চরিত্র বিদুর – যেন রত্নহারের মধ্যমণি – এক অবিশ্বাস্য ব্যক্তিত্ব – তিনিও ধৃতরাষ্ট্রের মত ব্যাস নিয়োজিত পুত্র । কিন্তু চরিত্র গুণে বিপরীত। রাজশক্তি, প্রভুত্বের শক্তি – এসব কিছু ছাপিয়ে ধর্মশক্তিরই জয় ঘোষিত হয়েছে মহাভারতে। সেখানে বিদুরই স্বয়ং ধর্ম রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। ধর্ম – অর্থাৎ নীতি, নিয়ম, সদাচার, আইন, রাজনীতি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই জ্ঞান অনুযায়ী কর্তব্য বা অকর্তব্য তিনি নির্ণয় করতেন কুরু রাজ পরিবারের। স্বয়ং ভীষ্ম আপদ বিপদকালে পরামর্শ নিতেন পুত্রসম বিদুরের কাছ থেকে। তিনি শান্ত সমাহিত – ঐশ্বর্যবিলাস-নির্বিকার এবং অন্যায় প্রতিবাদী।

মহাভারতে বলা হয়েছে – স্বয়ং ধর্মই বিদুর রূপে জন্মেছেন এবং আবার সেই সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, অবতারণা করা হয়েছে এক উপকাহিনির। যেখানে বলা হয়েছে – এক মুনির শাপবলেই ধর্মকে মনুষ্য জীবন লাভ করতে হয়েছে । শুধু মানুষ জীবন নয় তিনি শূদ্র হয়ে জন্মাবেন সেই শাপই ধর্মকে দেওয়া হয়েছিল । সেই মুনির নাম অনীমাণ্ডব্য। সব চেয়ে বড় কথা এই শাপটির পেছনে আছে মহাভারতের কবির এক অসাধারণ উদ্দেশ্য। মানুষ হতে হবে ধর্মকে। তার অন্তর্নিহিত সত্য এই যে – শুধু শাস্ত্র নির্দেশিত নিয়ম কানুন দিয়ে বিচার হয় না – তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই মানুষের হৃদয়। বিচারকের মননে, দর্শনে, বিশ্লেষণে যুক্ত হবে এক মানবিক মন – তাহলেই বিচার হবে সঠিক এবং ন্যায্য। এইজন্যই ধর্মকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়েছে।

আবার শূদ্র কেন ? শূদ্ররা হলেন সাধারণ মানুষের প্রতীক। একটি জনপদে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়র সংখ্যার চাইতে শুদ্রদের সংখ্যাই বেশী হয়। ধর্মকে ধর্মাসনে বসে শাস্ত্রের বাণী আউরে চললেই হবে না – তাঁকে জনতার মধ্যে নেমে এসে তাঁদের হয়ে নিপীড়িতের হয়ে কথা কইতে হবে। এটাই ধর্মের উদ্দেশ্য। তাই ধর্মকে শূদ্র হয়ে জন্মাতে হয়েছে।

এসব চরিত্রই মহাভারতের সৃষ্টি – কিন্তু অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে নতুন আলোয় উপস্থিত পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন লেখক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। পাঠক এঁদের কী ভাবে নেবেন আদৌ নেবেন কিনা সেটার ভার পাঠকের।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

মনে পড়ে কলকাতা বইমেলা - ২০২০
অস্ট্রেলিয়ার স্টলে

“যুক্তির ইমারত পেরিয়ে আমার মুক্তির বাতায়ন”

তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

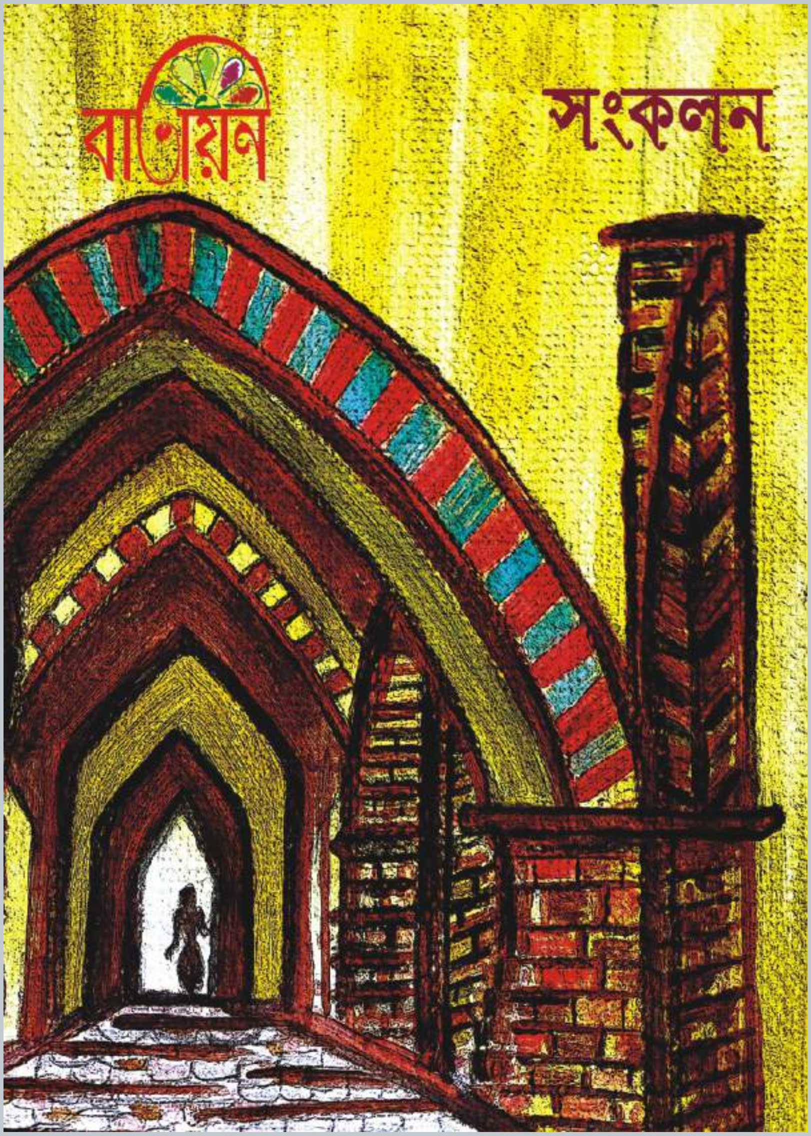

“প্রবাসীদের বাংলা-চর্চাকে বরং আরও কিছুটা নিবিড়ভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে হয়তো কেবল এই কারণেই যে, তাঁরা এই চর্চার পথে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, প্রতিনিয়ত। ফলে ভাষা-সংক্রান্ত যে-কোনও একটি কাজ আমরা যতটা অনায়াসে সংঘটিত করে ফেলতে পারি, দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অন্য আবহাওয়া ও সংস্কৃতির বাসিন্দা হয়ে তাঁরা সেটি তত অনায়াসে পারেন না।

বাতায়ন-ও তেমনই একটি প্রয়াস, প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চায় যাকে এখন অগ্রগণ্য বললে ভুল হয় না। অনেকদিন ধরে, অনেক কাঠিন্যের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই কাগজ আজ যেভাবে বিস্তীর্ণ পাঠককুলের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করে নিতে পারছে, তাতে বাংলা ভাষার একজন সামান্য কর্মী হিসেবে আমারও গর্ব হয় বৈকি। আমরা এখন কথায় কথায় বলি বটে, বিশ্বায়নের এই যুগে দেশ বলে আর নেই কিছু, কিন্তু আমি নিজে অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আজও দেশের মাটি থেকে দূরে বসবাস করে নিজের ভাষায় একটি যথাযথ মানের পত্রিকা বার করতে কতখানি ক্লেশ পোহাতে হয়। বাতায়ন বহুদিন যাবত সেই ক্লেশের আগুন পার করে এসে এখন পাঠকমহলে উজ্জ্বল।”

শ্রীজাত

“বাতায়ন”, ভালবাসা, ভুবনায়ন

বেশ বুঝতে পারছি আজকের ডিজিটাল দুনিয়াতেও মুদ্রিত একটি বই হাতে ধরার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় নি। এই অতিমারীর দিনে এটাই আশার কথা। গল্প, কবিতা, নাটক আর প্রবন্ধে বেঁধে বেঁধে থাকা – এসবের মধ্যে দিয়েই তো দূর হয়ে ওঠে নিকট বন্ধু আর পর হয়ে ওঠে ভাই। পাঠকদের মনে বাতায়নের জন্য এই ভালবাসার আসনটি পাতা যাতে পাতা থাকে সে চেষ্টা করে যাব আগামী দিনগুলোতে। ভবিষ্যতের চেহারা কেমন তা সবসময়ই আঁকা কঠিন। আজকের পরিস্থিতে হয়তো দুরূহ। কিন্তু আলোকশিখার মতো একটি ভাবনা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখি।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, “বাতায়ন” পত্রিকা গোষ্ঠী